# মাতৃসুখ দেখে আপ্লুত পুত্র

তারাশঙ্কর ব্যানার্জী

"মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে।
মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে।।"

দু'বছর পূর্বে ২৩ শে সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, গোঘাট থানা তথা আরামবাগ মহকুমার গর্বের সন্তান, শিক্ষায় বিশেষতঃ নারীশিক্ষায় ও উচ্চশিক্ষায় যুগান্তরকারী বিপ্লবের উদ্গাতা ও প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ প্রয়াত ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের জন্মবার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে তাঁর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করতে 'আরামবাগ নাগরিক মঞ্চের' পক্ষ থেকে যাই কালিপুর মোড়ে। স্বনামধন্য শিল্পী সর্বশ্রী হরিপ্রসাদ মেদ্দা, বিশিষ্ট সমাজসেবী অধ্যাপক শৈলেন সরকার, বেঙ্গাই অঘোর কামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. পরমার্থ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিগণ সঙ্গে ছিলেন। সেখান থেকে যাই নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান মিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম না। আরব্ধ কর্তব্যকর্মটি সমাপ্ত হওয়ার পরই অনিন্দ্য সুন্দর চির তরুণ-তপন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম কুমার দে মহাশয় তাঁর অফিসে আমাদের আপ্যায়ণের জন্য নিয়ে গেলেন। যাবার সময় সমস্ত বাড়ি-ঘর-দুয়ারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে গেলেন। যত দেখি শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে সমুদ্রগর্ভে নির্মিত মথুরা নগরীর কথা মনে পড়ে যায়। ঐ একই সঙ্গে মানসপটে ভেসে ওঠে ইং ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের করুণ চিত্রটি।

প্রাতিষ্ঠানিক মাতা যাঁরা আমাদের চোখে শিক্ষার আলো দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই মায়ের মতন। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সময় প্রচুর অর্থব্যয় করে প্রয়োজন ভিত্তিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। এই মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শুনেছি প্রথম কলেজ শুরু হয় আঢ্যদের বাড়ি থেকে। পরবর্তীকালে আঢ্য-বল্লভ-কুণ্ডু-নন্দী প্রভৃতি পরিবারের সহৃদয় ব্যক্তিদের প্রদত্ত জমিতে ও অর্থে এর সূচনা হয়। আমরা ১৯৬৩ তে যখন ভর্তি হই, তখন বাড়ি ঘরদোর বিশেষ ছিল না। অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক চিত্তপ্রিয় রায় মহাশয়। যেহেতু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অস্বাভাবিক ছিল না, তাই সহকারী অধ্যক্ষের কোন পদ ছিল না। তবে অধ্যাপকদের মধ্যে এবং অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পারিবারিক সম্পর্কের মত বেশ সুসম্পর্ক ছিল।

ঐ বছরেই কলেজে বাংলা ও গণিতশাস্ত্রে অনার্স খোলা হয়। তবে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর ঐ বিষয় দুটিতে আগ্রহের অভাব থাকায় মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত হয় ও পরবর্তীকালে শিক্ষকতা করার সুযোগ

* প্রাক্তন ছাত্র

পায়। সরোজ রায়, প্রেমানন্দ চ্যাটার্জী, মুক্তারাম চ্যাটার্জী প্রমুখ ব্যক্তিরা প্রথম ব্যাচে ছিলেন। পরের বছর থেকে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পায়।

বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন অধ্যাপক অম্বুজ বসু। অন্যান্যরা হলেন অধ্যাপক রবীন আদক, রমাপ্রসাদ ঘোষ ও নন্দলাল প্রামাণিক (আংশিক সময়ের জন্য) প্রমুখ। গণিত শাস্ত্র পড়াতেন অধ্যাপক পীযূষকান্তি পাল, তিনকড়ি নায়েক ও রথীন্দ্রনাথ হাজরা মহাশয়। ফিজিক্স পড়াতেন অধ্যাপক গণেশচন্দ্র হাটুই মহাশয়। কেমিস্ট্রির অধ্যাপক ছিলেন মাননীয় মদনমোহন মণ্ডল। বায়োলজির জন্য ছিলেন অধ্যাপক কমলকৃষ্ণ সরকার মহাশয়। যিনি পরবর্তীকালে গবেষণা করে Ph.D ও আরো পরে D. Sc. ডিগ্রি লাভ করেন।

সংস্কৃত পড়াতেন অধ্যাপক প্রণব কুমার দত্ত, ইংরাজী পড়াবার জন্য ছিলেন অধ্যাপক সুধীর কুমার দাস পাল, অধ্যাপক সত্যব্রত ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। নামে ফিলসফি বাস্তবে প্রায় সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন অধ্যাপক সিতাংশু কুমার দত্ত ও তাঁর সহযোগী ছিলেন অধ্যাপিকা অনিন্দিতা চৌধুরী। অর্থনীতির অধ্যাপক দীপক ব্যানার্জী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্য ছিলেন অধ্যাপক দুলালচন্দ্র মাল মহাশয়। ইতিহাস পড়াতেন অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ কর ও অধ্যাপক ব্রজেশচন্দ্র দাশ মহাশয়। কমার্স পড়াতেন সুধাংশু কুমার দত্ত (আংশিক সময়ের শিক্ষক), আদিত্যরঞ্জন চ্যাটার্জী ও ভবানী চট্টোপাধ্যায়। এঁদের কেউ কেউ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অতি উৎসাহী ও সহৃদয় ছিলেন। এন.সি.সি. অফিসার ছিলেন ডেমনেস্ট্রেটর নিশীথ ভকত চৌধুরী, অধ্যাপক ব্রজেশচন্দ্র দাশ ও অধ্যাপক দুলালচন্দ্র মাল। এন.সি.সি.-র ক্যাডারদের জন্য কলেজের দক্ষিণ দিকের পুকুরপাড়ে প্রথম ফায়ারিং রেঞ্জ তৈরি হয়। আমরাই প্রথম ফায়ার করে রেঞ্জটি সূচনা করি। ইংরাজী কিংবা ভূগোলে অনার্স থাকলে অবশ্যই যে কোন একটি জীবন গঠনের জন্য গ্রহণ করার চেষ্টা করতাম। আমার কেশবপুর স্কুল প্রথম চালু হওয়ায় ও প্রথম সার্জেন্ট হওয়ার সুবাদে এই কলেজে ভালভাবে কাজ করার জন্য আর. এস. এম. পদে মনোনীত হই। বেশ কয়েকজন বি.ও.সি. সার্টিফিকেট পাই। ইং ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লাগার ফলে স্থানীয় তিনটি কলেজের বাছা বাছা ক্যাডেটদের নিয়ে একটি মিলিটারি সর্ট কোর্স ট্রেনিং করানো হয় এবং আমরা কজন গেজেটেড অফিসার পদে যোগদানের সুযোগ লাভ করি। আমার সঙ্গে ছিলেন অমলেন্দু পাত্র, দেবকুমার (নতে) পাল প্রমুখ ব্যক্তি। ঐ যুদ্ধ স্থায়ী না হওয়ায় আমাদের সেনাবিভাগে যোগদানও করা হয়ে ওঠেনি।

খেলাধুলায় কলেজের বিশেষ সুনাম ছিল। ফুটবল ও ভলিবল খেলার ভালো রেওয়াজ আগে থেকেই ছিল। এছাড়া ইনডোর গেমে ক্যারম খেলার সময় সরোজ রায়কে একসাথে ও একহাতে চার-পাঁচটা করে ঘুটি ফেলতে দেখে অবাক হতাম।

প্রারম্ভিক অবস্থা তো। তাই লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি বিশেষ স্বচ্ছল ছিল না। পরবর্তীকালে ক্রমান্বয়ে

তা মানানসই হয়েছিল। পঠন-পাঠনের মান ছিল এককথায় উন্নতই, যার জন্য ইউনিভার্সিটিতে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সুনাম ছিল। আমাদের ব্যাচেরই ছাত্র ডাক্তার হয়েছিল মদন রায়। আমার ব্যাচের বা সামান্য আগে পরের কতজন যে হেডমাষ্টার হয়েছেন তা কত বলব। যেমন - আকিঞ্চন গাঙ্গুলী, সনৎ গাঙ্গুলী, সত্যেন দাস, পরিমল সরকার, তারক সরকার, গোবিন্দ দে, রবিকিঙ্কর দে, প্রেমানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সেখ হাসান ইমাম প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

চিত্তবাবুর পর বাম আমলে অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করার জন্য এলেন অধ্যাপক বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়। বাস্তবিকপক্ষে ওনার সময়ে কলেজের প্রকৃত বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়। নিজস্ব কর্মদক্ষতা ও দূরদর্শিতা না থাকলে কোন কালে কেউই কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি করতে পারেনা। ঐ গুণগুলি বিজয়বাবুর ছিল বলেই ওনার কার্যকালে উনি প্রতিষ্ঠানকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে গেছেন। প্রয়োজন মত বাড়িঘর, বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি ও বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স খোলা তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। উনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ভালোবাসতেন। প্রায়ই বলতেন - বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হয়ে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। আপনি কেশবপুর মহেন্দ্র ইনস্টিটিউশনের ছাত্র হয়ে প্রধান শিক্ষক হয়েছেন। আর আমিও নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে এই কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছি। এটা আমাদের জীবনে পরম পাওয়া নয় কী?

হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার অবজার্ভার হয়ে এই কলেজে ভিজিট করতে আসি। তখন দেখি কলেজে দুটি ভেন্যু করা হয়েছে দুই শক্তিকে দিয়ে। অর্থাৎ একটির দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক শক্তি ভট্টাচার্য মহাশয়, অন্যটির দায়িত্বে ছিলেন অধ্যাপক শক্তি মান্না মহাশয়। বিশাল অধ্যাপকমণ্ডলী কত না সুশৃঙ্খলভাবে দায়িত্ব পালন করলেন। তা দেখে মন ভরে গেল। আরও ভালো লাগল আমার সময়কার অধ্যাপকমণ্ডলীর সস্নেহ ব্যবহার দেখে। মনে হচ্ছিল তখনও আমরা গুরু-শিষ্যই রয়ে গেছি। অন্যান্য নবীন অথচ জ্ঞানে, গরিমায় প্রবীণ অধ্যাপকদের আলাপ ও ব্যবহার শেখার মতো, মনে রাখার মতো। এখনও পথে-ঘাটে দেখা হলে ওঁনারা যেভাবে ব্যবহার করেন, তা মন ভরিয়ে দেয়।

আমাদের প্রিয় কলেজটি উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এটি একটি মিনি ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হয়েছে কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম কুমার দে মহাশয়ের কার্যকালে। কোন কারণে যখনই কলেজে যাই, মনে পড়ে এ যেন শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত স্বর্গের ক্ষুদ্র সংস্করণ, যা সমুদ্র সংলগ্ন মথুরানগরীর মতো। আর ঐ নির্মাণ, চারুকলা ও প্রয়োজন ভিত্তিক সৃষ্টির অভিনব ও কুশলী অনবদ্য শিল্পের সমাহার দেখেই আমার লেখার শুরুতে উল্লেখিত সঙ্গীতের চরণ দুটি মনে পড়ে গেল। আরও মনে পড়ল, কলেজ মায়ের প্রাথমিক দুঃখিনী, কাঠকুড়ানি অবস্থা থেকে নয়নাভিরাম রাজমহিষী অবস্থায় পরিবর্তন দেখে আমি উচ্ছ্বসিত, আনন্দিত, পুলকিত ও আপ্লুত বোধ করছি।

শেষ কামনা - মায়ের যখন এতই উন্নতি হলো, নেতাজীর নামে এটি যেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। যতটা জানি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করার জন্য যতটা বিদ্যাবত্তার প্রয়োজন বর্তমান অধ্যাপকমণ্ডলীর অধিকাংশের মধ্যেই তা বিদ্যমান বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পরিশেষে বলি, শিক্ষাপ্রেমী ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টা প্রয়াত ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয় যদি বটবৃক্ষের ক্ষুদ্রতম বীজটি প্রথিত না করতেন, তা হলে আমরা আজ নেতাজী মহাবিদ্যালয় বা তার এই মহীরূহ অবস্থাটি পরিলক্ষিত করতে পারতাম না। আর অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর জীবন গঠনও হতো না। তাই সর্বশেষে ডাক্তারবাবুর উদ্দেশ্যে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানিয়ে আপাততঃ আসছি।

# আমার বিদ্যামন্দির

ড. রণজিৎ কুমার গোস্বামী

''এই তীর্থদেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গণে
যে পুজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন, -''

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ স্বাধীন হলো। স্বাধীনতার সময়ে আরামবাগ মহকুমায় অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, অপুষ্টি, মশার কামড়, রাস্তাঘাটের দুর্গতি, পেটে পীলে (প্লীহা) নিয়ে মানুষ অসহায়ভাবে দিন কাটাতেন। বর্ষাকালে বহু মানুষ কুঁড়ে ঘর চাপা পড়ে, সাপের কামড়ে মারা যেতেন। মানুষকে কুসংস্কার গ্রাস করে রেখেছিল। দেশে কিছু এম. ই. স্কুল, হাতে গোনা হাইস্কুল, বাকি সকলে গ্রামের বারোয়ারীতলার আটচালার পাঠশালায় পড়াশোনা শেষ করতেন।

স্বাধীনতার পরে মহকুমার শিক্ষিত, চিন্তাশীল স্বদেশ প্রেমিক, বিবেকবান দেশনায়কগণ সভা-সমিতি করে উচ্চশিক্ষার কথা ভাবছেন। সেই সময় মহকুমার দামাল ছেলে, দেশসেবক, স্বাধীনতা যোদ্ধা ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল সকলকে অবাক করে দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিম তীরে তখনকার নদীঘাটের দক্ষিণদিকে ১৯৪৮ সালের ১লা আগষ্ট প্রতিষ্ঠা করলেন 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়'। প্রতিষ্ঠার পরেই সমগ্র মহকুমার এবং মহকুমার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক প্রচারপত্র বিলি করে শুভ সংবাদটি সকলকে জানিয়ে দিলেন। প্রচারপত্রটি ছিল এইরূপ -
''আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় (শুভ উদ্বোধন) সম্পন্ন।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ধ্যানাত্মানন্দজীর পৌরোহিত্যে আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে। সভায় সুভাষনগরের প্রতিষ্ঠাতা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্নেহধন্য ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল, অধ্যাপক বিমল মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অনিলকৃষ্ণ রায়, দুর্গা চক্রবর্তী প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্বর্গীয় স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও স্যার ভূপেন্দ্রনাথ বসু, চিকিৎসা জগতের যুগান্তকারী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি মনীষীবৃন্দের এই আরামবাগেই পুণ্য জন্মভূমি।

ঐতিহাসিক যুগের ক্ষাত্রবীরশ্রেষ্ঠ রাজা বীরেন্দ্র সিংহের কীর্তি সমুজ্জ্বল ইতিহাসরূপে সাক্ষ্য দিতেছে। অথচ বর্তমান আরামবাগ আজ ভাগ্য বিবর্তনে অশিক্ষায়-কুশিক্ষায় ও নানা কুসংস্কারে ইতিহাসের পাতা থেকে লুপ্ত হতে বসেছে। তাই মরণোন্মুখ আরামবাগের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও ভবিষ্যৎ উন্নতি মানসে আরামবাগ সম্মিলনী

* প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ

গঠন করা হয়েছে। শিক্ষার সম্প্রসারণের জন্য এই বৎসর নেতাজী মহাবিদ্যালয় নামে আধুনিক বিজ্ঞান সম্ভারে আরামবাগের দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে 'আদ্য ভবনে' একটি আদর্শ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য আই. এ., আই. কম., আই. এস. সি. ক্লাসসমূহ এই বৎসর খোলা হল।

তাছাড়া কারিগরী শিক্ষার প্রচলনের চেষ্টা চলছে। তাই আজ সহৃদয় দেশবাসীর নিকট প্রার্থনা তাঁরা সর্বতোভাবে সাহায্য করে এই শুভ প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করুন।

নিবেদক

বিনীত

ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল, দেবেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ ডাঃ হরিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

তৎকালীন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর উদ্যোগে 'আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের' অনুমোদন, বর্ধমান মহারাজা ও স্থানীয় লোকজনের জমিদান, মহাবিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ, আসবাবপত্রাদি কেনা এবং অধ্যাপকদের মাহিনার জন্য কলকাতার বিশিষ্ট জনদের নিকট অর্থ সংগ্রহ, মহাবিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণকালে ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া চটের ঘরে ডাঃ পালের বসবাস সবই অবাক ঘটনা। প্রতিষ্ঠার প্রথম বছর অতি কম ছাত্রসংখ্যার কথা ও একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষ সংগ্রহের জন্য নেতাজী পরিবারের শ্রী শরৎচন্দ্র বসুকে ডাঃ পাল পত্র লেখেন। প্রত্যুত্তরে শরৎচন্দ্র বসু যে পত্রটি পাঠান, তা ছিল -

Woodbern Park
Calcutta-20
২২ শে আগষ্ট, ১৯৪৮
রবিবার

পরমস্নেহাস্পদেষু,

তোমার তিনখানি চিঠি পেয়েছি। নানা কারণে কিছুদিন বড়ই বিব্রত ছিলাম। সে জন্য সময়ে উত্তর দিতে পারিনি।

কলেজে ছাত্র সংখ্যা কিছু মন্দ হয়নি। প্রথম বছরে খুব বেশী আশা করা যায় না। তুমি যে কাজে ব্রতী হয়েছ তাতে সফলতা লাভ করবে আমার বিশ্বাস।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য ৩০০্ টাকার চেক এর সঙ্গে দিলাম। তুমি আমাদের স্নেহাশীর্ব্বাদ জেনো। ইতি

সাঃ শ্রীশরৎচন্দ্র বসু

শ্রীমান রাধাকৃষ্ণ পাল

পুনঃ ডাক্তার অতীন বসু মহাশয়কে আমার বলা হবে না। প্রিন্সিপাল হবার মত উপযুক্ত লোক আমার সন্ধানে নেই। যদি খোঁজ পাই জানাব।

শরৎচন্দ্র বসু

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত মহাবিদ্যালয়ে যাঁরা পড়াশোনা করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই স্থানীয়। যাঁরা দূর থেকে আসতেন তাঁরা আরামবাগ বা কালিপুরে ঘরভাড়া নিয়ে থাকতেন। নয়তো পাশাপাশি গ্রামগুলিতে আত্মীয় বাড়ি হতে কলেজে পড়াশোনা করতেন। কারণটি হলো, তখন তারকেশ্বর থেকে আরামবাগ আসতে ২১টি খাল, ২টি নদী পার হতে হতো। নদীর এপারে বর্ষাকালে বালীর রাস্তায়, গোঘাট-মদিনার রাস্তায়, উচালন, তিরোলের রাস্তায় দঁক (গভীর কাদা) পেরিয়ে আসতে হতো। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত রূপরেখার রাস্তাগুলিতে মাটির কাজ হয়েছে। ১৯৬০-এর পর পাকা রাস্তা হতে শুরু করেছে এবং দু-চারটি বাস চলতেও শুরু করেছে।

'আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়'-এর সঙ্গে আমার মানসিক সম্পর্ক ১৯৫৪ সাল থেকে। আমার বড়দা, মেজদা, সেজদা পর্যায়ক্রমে এখানে আই.এ., বি. এ. পড়েছেন। সদরে দাদাদের সঙ্গে আমি যখন পড়তে বসতাম, পড়ার ফাঁকে দাদাদের মুখে এই মহাবিদ্যালয়ের নানা কথা ও কাহিনী শুনেছি। শুনেই আমি কলেজটিকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। শুধু ভাবতাম আমি কবে ঐ ভালোলাগার জায়গায় যাবো!

শীঘ্রই সেই শুভদিন চলে এল। ১৯৬৬ সালে 'গোঘাট উচ্চ বিদ্যালয়' থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে 'যাকে চোখে দেখিনি, কথা শুনেছি, কথা শুনে যারে ভালোবেসেছি', সেই ভালোবাসার কলেজে সেজদা আমাকে ভর্তি করতে নিয়ে এলেন। 'বাংলা অনার্স'-এ ভর্তি হয়ে গেলাম। মনে হলো আজ আমার জীবন সার্থক হল। আবাল্য শ্রদ্ধাসহ ভালোবাসার বিদ্যামন্দিরকে দেখে আবিষ্ট হয়ে গেলাম। বিস্ফারিত চোখে দেখছি আর দেখছি। অজস্র প্রণাম জানিয়ে বাড়ি গেলাম। জুলাই-এর প্রথম সপ্তাহে ক্লাস শুরু হয়ে গেল। কয়েক দিনের মধ্যে জানলাম বিজ্ঞান বিভাগে অংক এবং কলা বিভাগে একমাত্র বাংলাতেই অনার্স খোলা হয়েছে। বাংলা অনার্সের বয়স মাত্র তিন বছর, আমরা চতুর্থ ব্যাচ। তখন তিন বছরের অনার্স পাঠক্রম। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ মিলে পার্ট ওয়ান - ৪০০ নম্বর, অল্টারনেটিভ বাংলা ২০০ নম্বর, তৃতীয় বর্ষ পার্ট টু - ৪০০ নম্বর। প্রথমবর্ষ বাংলা অনার্স-এ আমরা ৪ জন ছাত্রী আর ৫ জন ছাত্র। মূল কলেজ ভবন থেকে বেশ কিছুটা পশ্চিমদিকে একেবারে মাঠের ধারে নির্জন পরিবেশে দক্ষিণমুখী উপর নীচ চার কামরার প্রায় অন্ধকার এক মাটির বারান্দা বাড়ি। এই বাড়িতে অধ্যাপকদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। পরে নদীঘাটের উত্তরদিকে নদীর তীরে পাকা বাড়ি (কোয়ার্টার) হলে, অধ্যাপকগণ নতুন কোয়ার্টারে চলে আসেন। আর ঐ মাটির বাড়ির নীচের দুটি ঘরে আমাদের প্রথম বর্ষ বাংলা অনার্সের ক্লাস হতো।

আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় বাংলা অনার্সের ওই তিন বছর। সেই সময়ের কথা লিখতে বসে আমি এক রোমান্টিক নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক অম্বুজ বসু - অমায়িক ব্যবহার, পাণ্ডিত্যের ভাণ্ডার। প্রথম বর্ষে ভাষাতত্ত্ব পড়িয়েছিলেন। নিরস বিষয়কে সরস করে কীভাবে পড়াতে হয়, তার কৌশল তিনি জানতেন। আমার অধ্যাপক জীবনের ভাষাতত্ত্ব পড়ানোর সময় অম্বুজবাবুই ছিলেন আমার আদর্শ। অধ্যাপক রবীন আদক - লম্বা, ফরসা, কালো ফ্রেমের চশমা। সাদা ধুতি, পাঞ্জাবিতে কোনদিন ভাঁজ দেখিনি। কবি মানুষটি উচ্চারণের অসাধারণ স্পষ্টতা নিয়ে পড়িয়েছিলেন ছন্দ। বাংলা ছন্দ রবীনবাবুর নিকট যা আত্মস্থ করেছিলাম, অধ্যাপক জীবনে শিক্ষার্থীদের ছন্দ পড়িয়ে যথেষ্ট তৃপ্ত করতে পেরেছি বলেই মনে হয়েছে। ওই মাঠের ধারে মাটির ঘরে রবীনবাবু পড়িয়েছিলেন 'কুমুদরঞ্জন মল্লিকের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। স্পষ্ট মনে আছে সময়টা ছিল ভাদ্র-আশ্বিন মাস। মাঠে 'কচি ধান গাছে ক্ষেত ভরে আছে, হাওয়া দোলা দেয় তারে'। সেই পরিবেশে কবি কুমুদরঞ্জনের কবিতা পাঠ। এক গ্রামের কবির লেখা আর এক গ্রামের কবির কবিতা পাঠদান, সেই রোমান্টিক অনুভূতি কোনদিন ভোলা যায় না। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ ঘোষ পড়াতেন বাংলা অলংকার। পড়ানোর শুরুতেই বলেছিলেন, অলংকারের জন্য একটা মোটা খাতা কিনতে। কিনেওছিলাম। বোঝাচ্ছেন আর লেখাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে মনে গাঁথা হয়ে যাচ্ছে। স্যারের লেখানো সেই বাঁধানো খাতা আজও আমার অক্ষত আছে। সেই খাতার উপর নির্ভর করেই আমার কলেজ নিয়ে মোট ছটা কলেজে অলংকার পড়িয়েছি, সর্বত্রই সফল হয়েছি বলে শিক্ষার্থী-শিক্ষক উভয়েরই মনে হয়েছে। অধ্যাপক মুরারী মোহন মান্না পড়িয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস। স্যারের পড়ানোর দুটি ভাষার কালক্রমিক ইতিহাস সারাজীবনের মতো মনে গাঁথা হয়ে গেছে। বেঙ্গাই এ. কে. পি. সি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক নন্দলাল প্রামাণিক দুদিন ৯.৩০ টায় ক্লাস নেওয়ার জন্য ওই মাটির বাড়ির উপরতলায় স্বামী-স্ত্রীতে থাকতেন। মাত্র দু'রাত থাকার পর বেঙ্গাই চলে যেতেন। স্যার সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পড়িয়েছিলেন, যা ছিল অতুলনীয়। আজও মনকে নাড়া দেয়। আজও এই মহাপবিত্র মাতৃস্বরূপা শিক্ষামন্দিরে গেলেই যেন আকাশে বাতাসে মাটিতে মন্দির মায়ের গন্ধ খুঁজে পাই। এই মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম।

সেইসময় মহাবিদ্যালয়কেন্দ্রিক চতুর্দিকের শিক্ষার্থীদের বাড়ির আর্থ-সামাজিক অবস্থা খুবই নিম্ন মানের ছিল। শতকরা ৯০ জন শিক্ষার্থীর চাল-চলন, পোষাক, মুখের ভাব সবকিছুতেই একটা আর্থ-সামাজিক অসহায়তার চিত্রই ফুটে উঠত। চতুর্দিকের দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে পায়ে হেঁটে তারা হন্তদন্ত হয়ে ক্লাস করতে আসত। তখন এন. সি. সি. কম্পালসারি ছিল। এন. সি. সি. করার দিন আমার মতো অনেকেই এন. সি. সি-র ড্রেস পরে পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেল করে ক্লাস করতে আসত। আমরা অনার্সের ছেলেরা ৯.৩০ থেকে ৪.৩০ পর্যন্ত ক্লাস করে, ৬টা পর্যন্ত এন. সি. সি করে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতাম। বাড়িতে

পোষাক ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে মুড়ি খেয়ে হারিকেন বা লণ্ঠন নিয়ে পড়তে বসতাম। আবার পরের দিন সকালে প্রস্তুত হয়ে ৯.৩০ এর ক্লাস করতে আসতাম। কোনক্রমেই ক্লাস ফাঁক দিতাম না। তখনতো টিউশানি পড়ার চল ছিল না।

আমার বাড়ি গোঘাট থানার রতনপুর গ্রামে, ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের ঠিক পাশের বাড়ি। স্বভাবতই ডাঃ পালের একমাত্র পুত্র হরিসাধন আমার বাল্যবন্ধু ছিল। হরিসাধন আর আমি প্রায়ই বিকালে সাইকেলে করে বেঙ্গাই যেতাম। এই কারণে ডাঃ পাল, অধ্যক্ষ অমিতাভ মহাপাত্র এবং প্রধান শিক্ষক গোকুলচন্দ্র মাল আমার বাল্যপরিচিত ও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ডাঃ পালের লোকান্তরের পর বেঙ্গাই থেকে ওনার আলমারিগুলি এনে বিভিন্ন জাতীয় ডায়েরি ও বিশিষ্টজনদের চিঠিপত্র দুজনে পড়েছি আর আশ্চর্য হয়ে দুজনে ভেবেছি।

তখন বেঙ্গাই রুটে রাহা কোম্পানির একটি মাত্র বাস চলত। বাড়ি থেকে ৪৫ মিনিট হেঁটে বাস ধরে ৯.৩০ এর ক্লাস করতে আসতাম। গোঘাট রুটে দু-তিনটে ২১ নম্বর বাস চলত। ৪.৩০-এর ক্লাস করে ২১ নম্বর বাস ধরে গোঘাটে নেমে এক ঘন্টা হেঁটে বাড়ি ফিরতাম। এমনও হয়েছে কোনদিন বিশেষ কারণে বাস চলেনি, হেঁটেই ক্লাসে এসেছি আবার হেঁটেই বাড়ি ফিরেছি।

তখন সবমিলে কলেজে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫০০ থেকে ৫৫০-এর মতো। তারমধ্যে ছাত্রী ছিল ৩৫ থেকে ৪০ জন। ছাত্রীদের শাড়ি পরার চল ছিল। কিন্তু সাইকেল চড়ার চল ছিল না। ছাত্ররা পায়জামা অথবা ধুতি পরে কলেজে আসত। অফিস ঘর, তার পাশ দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। দোতলায় একদিকে অধ্যক্ষের কক্ষ, অন্যদিকে লাইব্রেরি। নীচে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মুখে একটি ঘর, সেটি ছিল ছাত্রীদের কমনরুম। অধ্যাপক স্টাফ রুম থেকে বের হলে, অধ্যাপকদের পিছনে ছাত্রীরা ক্লাসে যেত। অধ্যাপক ক্লাস থেকে বের হলে অধ্যাপকদের পেছনে ছাত্রীরা কমনরুমে চলে আসত। ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রীদের মেলামেশা এমনকি অহেতুক কথা বলার কোনও প্রশ্নই ছিল না। তখন ব্রীজ হয়নি। সকলকে কলেজের সামনে নদীঘাট দিয়ে আরামবাগ যেতে হয়েছে। শীত-গ্রীষ্মে হাঁটুজল পেরিয়ে। কোন কোন বছর বাঁশের অপোক্ত টলমলে ব্রীজও হয়েছে। আর বর্ষাকালে ভরা নদীতে নৌকা করে। মাঝিদের বাড়ি ছিল কলেজের সামনে একেবারে নদীর ধারে। সকলকেই নদী পার হতে হয়েছে। কারণ কলেজের বই কেনার একমাত্র দোকান ছিল 'আরামবাগ ছাত্রমহল'। দোকানের মালিক ব্রজমোহনদা প্রায় সময়ই থাকতেন না। বই চাইলেই মহাদেবদা একমুখ হেসে বই বের করে দিতেন। বর্ষাকালে ভরা নদীতে নদী পার হওয়া সে এক অভিজ্ঞতা। সাধারণ যাত্রী, সেইসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীরা নৌকায় উঠত। নৌকা মাঝনদীতে গেলে কলেজের কিছু দুরন্ত ছাত্র নৌকার একদিকে পায়ের চাপ দিয়ে নৌকা দোলাত। প্রায় সকলে ভয়ে চিৎকার করত, তখন মাঝিদাদারা ভীষণ রেগে বকাবকি করতেন। রেগে বলতেন, ''তোমাদের এই রকম বদমায়েশি প্রিন্সিপাল স্যারকে বলে দেব''।

সেইসময় মহাবিদ্যালয়ে সবদিকে আড়ম্বর না থাক, একটা আনন্দঘন হৃদয়স্পর্শী পড়াশোনার পরিবেশ ছিল। অফিসকর্মী-অধ্যাপক ও শিক্ষার্থী সকলের মধ্যে একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। সকলেই যেন পিতা-পুত্র, দাদা-ভাই-এর সম্পর্কের মধ্যে বাঁধা থাকতাম।

নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে মাত্র তিন বছরের ছাত্রজীবনে মহাপ্রীতিঘন পবিত্র সময়, যা আমার মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে আছে। সেই প্রীতিঘন মুহূর্তগুলি নিশ্চিতভাবে আমাকে সমস্ত জীবনই বয়ে নিয়ে চলতে হবে। তাই মহাকবির ভাষায় বলি -

"যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই -
যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।"

# ৭৫ বর্ষ পূর্তি উৎসবে নেতাজী মহাবিদ্যালয় ও আমরা

অজয় বেরা

এই মহকুমা সংলগ্ন এলাকায় নবজাগরণ প্রসূত শিক্ষালোক বিচ্ছুরণের ঊষালগ্নে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অস্বীকারের কোনও উপায় নেই। বিদ্যাসাগরের ১০০ তম মৃত্যুবর্ষ স্মরণে প্রয়াত অধ্যাপক অম্বুজ বসু 'সাগর' নামে একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা দিয়ে গেছেন। বর্তমানে ২০০তম জন্মবর্ষে 'বোধোদয়' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছে। তুলনামূলক আলোচনা চলতে পারে। রামমোহনকে নিয়ে এমন কোন উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা এই মহকুমায় লক্ষ্য করা যায় না। তবে রামমোহনের ১৭৫ তম জন্মবর্ষে রাধানগরে উৎসব উপলক্ষ্যে হুগলী জেলা পরিষদের একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়েছিল। মহকুমায় শিক্ষা প্রসারে এইগুলি উপাদান যোগানকারী হতে পারে।

ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, স্বাধীনতা আন্দোলনের নবালোকে আলোকিত সারা দেশের সঙ্গে এই মহকুমায় সমকালীন দেশপ্রেমীদের অবদানে পাঠশালা-টোল-মক্তব-মাদ্রাসা ইত্যাদির পাশাপাশি ৫-১০ কিমি অন্তর পাশ্চাত্য অনুকরণে প্রাথমিক, এম, ই, মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা, ভূমিদাতা, অর্থদাতা, কায়িক শ্রমদাতাদের নাম এলাকায় এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। প্রাক স্বাধীনতা পর্বে এই মহকুমায় কিছু বিদ্যালয় গড়ে উঠলেও উচ্চশিক্ষার জন্য কোন মহাবিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। মহাবিদ্যালয়ের চাহিদার ভিত্তি তৈরি হয়েছিল ১৮৫৪-৫৫ সালে বিদ্যাসাগরের খানাকুল, রামনগর, কামারপুকুর, রামজীবনপুর, মায়াপুর, রাধানগর, মলয়পুর, কেশবপুরে মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত আরামবাগে কোনো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ উৎসবের মধ্যেই ১৯৪৮ সালের ১লা আগষ্ট ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল (সকলের ডাক্তারদা), সঙ্গী শরৎ বাডুই ও আরো কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে সরোজ আঢ্য, সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্যদের একটি বাড়িতে বেশকিছু ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ছাত্র নিয়ে এই নেতাজী মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষক ছিলেন মাত্র ৪-৫ জন। জনশ্রুতি হল শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রী অতুল্য ঘোষ যখন এখানে উচ্চশিক্ষার জন্য ভূমি খোঁজ করছিলেন - সেই মুহূর্তে ডাক্তারদা এই প্রতিষ্ঠানের ঘোষণা করেছিলেন। ১৯৬২-৬৭ সাল পর্যন্ত ছাত্রী ভর্তির নমুনা ছিল না। প্রথম বৎসর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে দুই বৎসরের ইন্টার মিডিয়েট এবং ১৯৫৭ সালে অনুমোদিত ডিগ্রি কলেজটি ১৯৬০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊষালগ্ন থেকেই বর্ধমানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এখনও মহকুমার শিক্ষাঙ্গনকে আলোকিত করে চলেছে। অবশ্য ১৯৬০-৬১ সালে বেঙ্গাই,

* প্রাক্তন ছাত্র

কামারপুকুরে পৃথক দুটি প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয় এবং পরে আরো চারটি মহাবিদ্যালয় উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করে চলেছে।

বর্তমানে বারো একর জমির উপর মহাবিদ্যালয়ের ভূমিদাতাদের মধ্যে আঢ্য-বল্লভ পরিবার ছাড়াও অনেক ক্ষুদ্র চাষী, ভাগচাষীদের জমি ছিল। বর্তমানে কলকাকলিতে মুখরিত ঝকঝকে, আমোদিত মহাবিদ্যালয়ের তৎকালীন ঘাম-রক্ত ঝরা উদ্যোগের নিয়ত পরিবর্তনশীল আর্থসামাজিক-ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক জনপটভূমির চিত্র বর্তমান মহাবিদ্যালয়ের পরিচালক, সংগঠন, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচেষ্টায় ক্রমোন্নতির সোপান অনুধাবন করতে সহায়ক হতে পারে বলে মনে হয়।

বস্তুত, সমকালীন বাস্তব পরিস্থিতিতে সময়ের চাহিদা পূরণে এই অঞ্চলে উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটাতে এগিয়ে এলেন প্রণম্য ডাক্তারদা ও তাঁর সঙ্গীসাথীরা। সঙ্গতে ঠেকাই দিতে এগিয়ে এলেন সংগ্রামী ছোট-মাঝারী কৃষককুল। বর্তমানে ডাক্তারদার মূর্তি স্থাপিত হয়েছে প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের নেতৃত্বে। আমরাও তাঁর জন্মদিন পালনে অংশগ্রহণ করে নিজেদের ঋণমুক্ত করার চেষ্টা করলেও সঙ্গীসাথী ও সঙ্গতকারীদের স্মরণ করি না।

বর্তমান ৭৫ বর্ষপূর্তি উৎসবে আমরা পঞ্চম-ষষ্ঠ দশকের প্রাক্তনীরা আমন্ত্রিত হয়ে এই উৎসবকে শুভ উৎসবে পরিণত করার শুভ মানসে সাক্ষী থাকার লোভে আগ্রহের সঙ্গে যোগ দিয়েছি। তাই ক্ষয়িষ্ণু দুর্বল স্মৃতিশক্তি রোমন্থনে ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখলাম।

মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান কাঠামোটি এক নজরে ঃ- ক) লাইব্রেরির বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৫৯ হাজার ছাড়িয়েছে। সঙ্গে আছে ছোট একটি সংগ্রহশালায় শিল্প-সাহিত্যের বেশকিছু অমূল্য সম্পদ। চাই এর সদ্ব্যবহার। খ) মহাবিদ্যালয়ে বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ২৭৩৩ জন, ছাত্রী সংখ্যা ২৫২২ গ) শিক্ষক সংখ্যা ১১৩ জন । ঘ) অশিক্ষক কর্মী সংখ্যা ৪১ জন। ঙ) ছাত্রদের দুটি হোস্টেলে ২১০ জন আবাসিক এবং ছাত্রীদের দুটি হোস্টেলে ১৩৩ জন আবাসিক। এছাড়াও এন. সি. সি., এন. এস. এস. প্রশিক্ষণ সুনামের সঙ্গে চলে। দূরবর্তী শিক্ষার দুটি বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স চালু আছে। ২১টি বিষয়ে অনার্স ও তিনটি বিষয়ে পার্স কোর্স বর্তমান।

বর্তমানে ক্রমোন্নতির পথে নেতাজী মহাবিদ্যালয়। NAAC পরিদর্শনে বর্তমান প্রতিষ্ঠান প্রেমী, ছাত্রদরদী, সুদক্ষ অধ্যক্ষের সুপ্রচেষ্টায় B++ স্তরে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু সর্ব সন্তুষ্টির স্থান নেই। মহাবিদ্যালয়কে B++ থেকে A+ স্তরে এবং অন্যতম গবেষণাকেন্দ্রে উন্নীত করার লক্ষ্যে শিক্ষক-অশিক্ষক এবং পরিচালকমণ্ডলীর অগ্রণী ভূমিকাই আমাদের মতো প্রাক্তনীদের কাম্য।

মহকুমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যমণি নেতাজী মহাবিদ্যালয় সর্বক্ষেত্রেই অনেক পরিবর্তনের স্বাক্ষীরূপে

নিজেও পরিবর্তিত হয়েছে এবং এই পরিবর্তন চলতেই থাকবে। এই পরিবর্তন পিছনের দিকে যাতে না হাঁটে সেইজন্য সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে। দেখতে হবে সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত শক্তিশালী প্রতিবন্ধক যুক্তিতর্ক পরম্পরাহীন ক্ষয়িষ্ণু অতিকল্পবাদ জনিত স্রোতের প্রতিকূলে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে যেতে শিক্ষক-অশিক্ষক-অধ্যক্ষ মহাশয় ও পরিচালক মণ্ডলীর দৃঢ় অবস্থানের ভূমিকা। অনগ্রসর শ্রেণী থেকে আগত শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দানে আরও কার্যকরী ভূমিকা প্রয়োজন। অবশ্যই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ভিত্তি হতে হবে অতিকল্পবাদ বিপরীতে মানববাদ প্রসূত মানবাধিকারে আধুনিক মানুষ গড়ার রাস্তায় অগ্রসর হওয়া । এজন্য চাই অতিকল্পবাদ বিপরীত বিকল্প সংস্কৃতির অনুশীলন। সব উপাদানই বর্তমান লাইব্রেরিতে মজুত। চাই সদ্ব্যবহার।

আমাদের মতো প্রাক্তনীদের এই কয়েকটি বার্তা পাঠালাম বর্তমান মহকুমার শিক্ষার অগ্রগতির উদ্দেশ্যে। উৎসবে আমাদের অংশগ্রহণের আমন্ত্রণের জন্য উৎসব পরিচালকমণ্ডলীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

# বিদ্যালয় থেকে মহাবিদ্যালয় - একটি অনুস্মরণ

সুধাংশু শেখর যশ

স্মৃতির খাতায় মুহূর্তের সময়ের ছাপ হয়তো অস্পষ্ট হয়, কিন্তু মুছে যায় না। সালটা ১৯৬৯, বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে মহাবিদ্যালয়ের আঙিনায় পা রাখবো। কোতুলপুর হাই স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করলাম ৩০শে মার্চ। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র তাই অবশ্য প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা বাকি। কবে হয়েছিল সেটা ঠিক মনে নেই। এরই মধ্যে বাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ থাকায় বাইরের কলেজে পড়বার স্বপ্ন যে ক্ষীণ হয়ে আসছিল বুঝতে পারি। ছয় ভাইয়ের মধ্যে আমি ছিলাম বড়। বাকিদের পড়াশোনার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। অগত্যা আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে গণিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হলাম। নতুন আঙিনায় নতুন স্বপ্ন নিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হলো। ক্লাস শুরু হল প্রায় জুলাই মাসের মাঝামাঝি। প্রথম প্রথম বেশ অন্যরকম লাগতো, ইউনিফর্ম ছাড়া অন্য পোশাকে কলেজ আসতে পারা মানে 'আমি এখন বড় হয়ে গেছি' - এই ভাবটা ক্লাসরুম বা কলেজ চত্ত্বরে বেশ প্রকাশ পেতো। ওহ! বলতে ভুলে গেছি যে আমাদের সময়ে তিন মাস ক্লাস হবার পর এলিমিনেশন টেস্ট দিতে হতো। খুব ভয় পেত, অনার্স পাকাপাকি ভাবে পাবো তো? যাইহোক ওই টেস্টে পাশ করলাম। স্থায়ীভাবে অনার্সের জন্য পড়াশোনা শুরু হলো। আমরা প্রায় ৫০ জন ছাত্র ভর্তি হয়েছিলাম, তারমধ্যে ৪০ জন অনার্স পড়ার জন্য নির্বাচিত হলাম। আমাদের ম্যাথামেটিক্স ডিপার্টমেন্ট সম্ভবত ওয়ান অফ দা ওল্ডেস্ট ডিপার্টমেন্ট ইন দ্যাট কলেজ - চারজন পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক ছিলেন। বিভাগীয় প্রধান ছিলেন শ্রী পীযূষকান্তি পাল মহাশয়। এছাড়াও ছিলেন শ্রী নবকুমার কুণ্ডু, শ্রী তিনকড়ি নায়েক, শ্রী রথীন্দ্রনাথ হাজরা মহাশয়। ম্যাথামেটিক্স নিলেও মাথা যে ফেটে যায়নি তার কারণ এই চারজন স্যার অত্যন্ত যত্ন ও দক্ষতার সাথে বিষয়টিকে আয়ত্ত করতে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়াও ফিজিক্সে শ্রী গণেশচন্দ্র হাটুই ও শ্রী সৃষ্টিধর সামন্ত স্যার এবং কেমিস্ট্রিতেও দু'জন শ্রী মদনমোহন মণ্ডল ও শ্রী নিশীথ ভকত চৌধুরী। ওনারা প্রত্যেকেই ছিলেন নিজ নিজ বিষয়ের এক এক জন দিকপাল।

এবার আসি কলেজ বিল্ডিং-এর কথায়। আমাদের সময়ে তেমন নির্দিষ্ট কোন সুসজ্জিত শ্রেণীকক্ষ ছিল না। মেইন বিল্ডিং তিন কক্ষ বিশিষ্ট দক্ষিণ দুয়ারী আর খড়ের চালের আরো দুটি ঘর। খেলার মাঠের পশ্চিমদিকে আরও তিনটি রুম ছিল টিনের চালের। সেগুলি সবার ল্যাবরেটরি হিসাবে ব্যবহৃত হত। UGC বিল্ডিং-এ অবশ্য ৩-৪ টি ঘর তৈরি হচ্ছিল আমরা তার ছাদ হতে দেখে আসিনি।

এখন অবশ্য আর মেলাতে পারি না - পাঁচটা পেল্লাই বিল্ডিং। তাতে আবার স্মার্ট ক্লাসরুম এবং আরো

* প্রাক্তন ছাত্র

কত কী। কলেজের দক্ষিণদিকে অবশ্য হোস্টেল ছিল, এখন তা সংখ্যায় বেড়েছে। আমার ভ্রাতৃপ্রতিম বর্তমান প্রিন্সিপালের অধীনে ও সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে কলেজের সার্বিক উন্নতি দেখে বেশ ভালো লাগে। যাইহোক, আমাদের সময়ে ফিরে যাই। তৎকালীন প্রিন্সিপাল ছিলেন শ্রী চিত্তপ্রিয় রায় মহাশয়। এক বছরের মধ্যে উনি চলে গেলেন। তারপর যথাক্রমে পীযূষবাবু ও দুলালচন্দ্র মাল মহাশয় অ্যাক্টিং প্রিন্সিপাল হিসাবে কলেজ পরিচালনা করেন। দুলালবাবু আবার এনসিসি অফিসারও ছিলেন। বলে রাখি, আমাদের আমলে ছাত্রদের প্রথম দুই বৎসর বাধ্যতামূলক NCC করতে হতো। এমনকি চিত্তরঞ্জনে বরাকর নদীর ধারে জঙ্গলঘেরা ফাঁকা জায়গায় একবার এনসিসি ক্যাম্পেও যোগদান করেছিলাম। সেইসময় শুধু বাংলা ও গণিত - এই দুই বিষয়েই অনার্স কোর্স চালু ছিল। কঠোর অনুশাসন অথচ সস্নেহে পাঠদান, এই দুইয়ের এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখা যেত আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে। ইংরেজির প্রতি একটা টান থেকেই বোধহয় মাঝে মাঝে নিজের ক্লাস ড্রপ করে চলে যেতাম প্রফেসর রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ক্লাসে। এমনই এক দিনের কথা মনে পড়ছে। R. G. স্যারের ক্লাসে চুপিচুপি ঢুকে পড়েছি। উনি ম্যাকবেথ পড়াচ্ছেন। কী ড্রামাটিক কণ্ঠস্বর! "three witches come" ... আর সেই বিখ্যাত লাইন "fair is foul, and foul is fair" ... ক্লাসের পরে চোখে জল ধরে রাখতে পারিনি।

এইভাবে দু'বছর কাটলো, আমাদের পার্ট ওয়ান পরীক্ষা এসে গেল। ১৯৭১-এর ১২ই জুন পরীক্ষা শেষ। ইতিমধ্যে কলেজ জীবনের অন্তিম বর্ষে এসে পড়েছি। সারা বছর স্যারেদের ক্লাস করে (আমাদের সময় ক্লাসের বাইরে টিউশন পড়ার দরকার হতেই না) অবশেষে ১৯৭২ সালের জুন মাসে লিখিত পরীক্ষা শেষ আর আগস্ট নাগাদ প্র্যাক্টিক্যাল। ফাইনাল ইয়ার-এ আমরা বেশ কজন ভালো রেজাল্ট করেছিলাম, তবে প্রথম শ্রেণী সে বছরের মত সবার অধরা। প্রিয়বন্ধু রবীন পাল সর্বোচ্চ ফল করেছিল। এখন যাদবপুর ইউনিভার্সিটির নামকরা প্রফেসর। আর ছিল মাহরুফ হোসেন (রিজার্ভ ব্যাংকে কর্মরত), ভাস্কর কুণ্ডু (সেও শুনেছি ব্যাংকেই আছে) আর দু'জন বান্ধবী প্রণতি ও সুষমা - স্কুলের শিক্ষিকা। আমিও শিক্ষক হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিধাতা পুরুষ অন্য কিছুই ভেবে রেখেছিলেন। মায়ের আদেশে ব্যবসা শুরু করি সংসারের হাল ধরতে। অনেক ওঠা পড়ার খাতে জীবন এগিয়েছে। ইতিমধ্যে দ্বারকেশ্বরের ওপর দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে আর তারই তীরে নেতাজী নামাঙ্কিত এই কলেজ এতগুলো বছর ধরে বাংলা মায়ের কত না সুসন্তানকে সুশিক্ষিত করে চলেছে। এখন তো বিভিন্ন বিভাগে দক্ষিণ দামোদরের প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে বলে শুনেছি। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাকে আমার আন্তরিক ও বিনম্র প্রণাম জানাই এবং নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

# পুরানো সেই দিনের কথা - কলেজবেলার স্মৃতি

জগদানন্দ যশ

কলেজবেলার অণুস্মরণিকা লিখতে বসেছি। স্মৃতি বাসরে কত না ঘটনার এলোমেলো আনাগোনা। কীভাবে শুরু করব সেটা ভাবতে ভাবতে মন ফিরে গেল ১৯৭৬-৭৭ সালে। বর্তমান ১০ + ২ দ্বাদশশ্রেণীর পাঠক্রম শুরু হয়েছিল ১৯৭৬ সালে এবং এই দুই বৎসর তা কলেজে পড়ানো হতো। কারণটা বোধহয় তদানীন্তন স্কুলগুলিতে উপযুক্ত লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর অভাব। ১৯৭৬ সালে আমার গ্রামের স্কুল থেকে প্রথম শ্রেণীতে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হই স্কুলের মধ্যে প্রথম হয়ে। কলেজে উচ্চমাধ্যমিক পড়ব - এই আনন্দ ভরপুর উপভোগ করছি। এই সূত্রেই নিকটবর্তী নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে আমার উপস্থিতি, যে মহাবিদ্যালয় এই বছর তার প্লাটিনাম জয়ন্তী বর্ষ পূর্ণ করছে। হিসেব অনুযায়ী স্বাধীনতা লাভের পরের বছর ১৯৪৮ সালের ১লা আগষ্ট এই কলেজ স্থাপিত হয়। বাবার মুখে শুনেছিলাম দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আরামবাগে এসেছিলেন এবং এক জনসভায় জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন। বাবা তখন কালিপুর স্বামীজি হাই স্কুলের ছাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়, নেতাজীর অন্তর্ধান এবং তারপর ভারতের স্বাধীনতা লাভ। নেতাজীর আরামবাগ সফরের সাথে কলেজের নামকরণের যে বিলক্ষণ যোগ আছে তা বলাই বাহুল্য।

ছাত্র জীবনের কঠোর পরিশ্রমের সুফল পাওয়ার সময় যদি মাধ্যমিক হয়, তাহলে উচ্চশিক্ষার বীজ বপণের সময় হল উচ্চমাধ্যমিক। মানুষ গড়ার কারিগর যে সমস্ত অধ্যাপকদের পেয়েছিলাম স্বপ্ন পূরণের জন্য, তাঁরা ছিলেন আমাদের জীবনের দেবদূত। উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টের উপরেই ভবিষ্যতের ভিত গড়ে ওঠে এবং সেই শিক্ষা, সাহচর্য, সান্নিধ্য, অনুশাসন সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। তাঁদের নাম উল্লেখ না করে পারছি না - শ্রদ্ধেয় সর্বশ্রী পীযূষকান্তি পাল, রথীন্দ্রনাথ হাজরা, নবকুমার কুণ্ডু (গণিত), পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী (কেমিস্ট্রি), সৃষ্টিধর সামন্ত, আনন্দ মণ্ডল (ফিজিক্স), পরিমল হাজরা, তরুণকান্তি ঘটক (বায়োলজি), অম্বুজ বসু, মুরারি মোহন মান্না (বাংলা), সত্যব্রত ভট্টাচার্য এবং রবীন্দ্রনাথ ঘোষ (ইংরাজী) মহোদয়গণ সকলেই পুত্র স্নেহে পড়াতেন। পীযূষ স্যারের জলদ গম্ভীর গলায় মাঝে মাঝে বকুনিসহ ক্যালকুলাস পড়ানো বা রবীন্দ্রনাথ স্যারের স্টেজ অ্যাক্টিং করে করে ইংলিশের যে কোনো টেক্সটকে ফিল করানো আজও চোখের সামনে ভাসে। ক্লাস টেন পাশ করেই হঠাৎ কলেজে ভর্তি হলে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের একটু মাতব্বর ভাবে। কিন্তু স্কুলের গন্ধটা তো গায়ে থেকেই যায়, তাই একটু শিশুসুলভ দুষ্টুমিও করে ফেলে। একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা জমবে ভালো। একদিন বায়োলজি ক্লাসে স্যার বাইনোমিয়াল নোমেনক্লেচার পড়াতে পড়াতে বললেন - ''যেমন ধরো ধানের

* প্রাক্তন ছাত্র

সাইন্টিফিক নেম 'oriza sativa' বা ধরো" বলে হঠাৎ জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই যে কৃষ্ণচূড়া ফুল, ওটার নাম বিজ্ঞানের ভাষায় caesal pinia"। সঙ্গে সঙ্গে আমার পাশের বন্ধু জোরে গেয়ে ওঠে, "ওই সেই সিজেল পিনিয়া যার তলে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ ... হাতে হাতে ... কথা যেত হারিয়ে"! তারপর যা হলো বিস্তারিত বলার আর দরকার নেই। পাশে বসা কালপ্রিট বন্ধু ততক্ষণে হাই বেঞ্চের তলায় লুকিয়ে পড়েছে, আমি ক্লাসের বাইরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ১০ মিনিট। রবীন্দ্রনাথের "তালগাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে" খুব মনে পড়ছিল। অর্থাৎ স্কুলের মতো কলেজের স্যারেরাও অনুশাসনটা কিন্তু ঠিক বজায় রাখতেন। এখনো প্রতিপলে বুঝতে পারি ওই অনুশাসন ছাড়া তালগাছের মতো শিরদাঁড়া সোজা করে মাথা উঁচু করে কেউ বাঁচতে পারে না এবং সত্যিকারের মানুষ হতে গেলে ওইরকম অনুশাসন ও সময়নিষ্ঠা কতটা জরুরী।

যতদূর মনে পড়ে ১৯৭৯-৮০ সালে একটি একতলা ক্লাসরুম বিল্ডিং, একটি এডমিনিস্ট্রেটিভ কাম প্রিন্সিপাল বিল্ডিং, একটি টিনের ছাউনি দেওয়া ল্যাবরেটরি ও একটি লাইব্রেরি কাম প্রফেসরস রেস্ট রুম ছিল। সাইন্স, কমার্স আর আর্টস মিলিয়ে চার-পাঁচটি বিষয়ে অনার্স পড়ানো হতো এবং আরো বেশ কয়েকটি সাবজেক্টে পাশ কোর্স পড়ানো হতো। বর্তমানে পাঁচটি ক্লাসরুম বিল্ডিং, অত্যাধুনিক ও সুসজ্জিত লাইব্রেরি এবং ল্যাবরেটরি সহ একুশটি বিষয়ে অনার্স এবং তিনটি বিষয়ে পাসকোর্স পড়ানো হয় বলে জেনেছি। বর্তমান অধ্যক্ষ মহাশয়ের সুনাম ও দক্ষতায় পুরানো ঐতিহ্য বজায় রেখে আজও এই মহান প্রতিষ্ঠানটি প্রত্যেক বছর শয়ে শয়ে সুশিক্ষিত নাগরিক দেশকে উপহার দিয়ে আসছে - যাঁরা বিভিন্ন সংস্থায় বা প্রতিষ্ঠানে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং দেশের অগ্রগতির ধারক ও বাহক। এই কলেজের বহু ছাত্র এমনকি আমার দু-তিনজন সহপাঠীও বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। পড়াশোনার সাথে সাথে খেলাধুলা, সোশ্যাল কালচারাল প্রোগ্রামও এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। আশির দশকে যখন রিয়েলিটি শো-এর রমরমা ছিল না, তখন গানের নামকরা বিভিন্ন শিল্পীদের নিয়ে কলেজ ফেস্ট ছিল ছাত্র-ছাত্রী তথা আরামবাগ ও সন্নিহিত অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ। সব মিলিয়ে দু'বছর নিষ্ঠাভরে শিক্ষা গ্রহণের সাথে সাথে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ঘটনাপঞ্জীর বহুমুল্য অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে জীবনকে অনেকটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছি। এজন্য এই মহান মহাবিদ্যালয়ের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ এবং প্রাক্তনী হিসাবে গর্ব অনুভব করি। শহর ছাড়াও সন্নিহিত শতাধিক গ্রাম থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা এই কলেজে পড়তে আসছে। অসীম সাহসী বীর সুভাষের দেশপ্রেম যেভাবে ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাঁর নামাঙ্কিত কলেজ নেতাজী মহাবিদ্যালয় দিকে দিকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেবে এই প্রার্থনা করি। ব্যাপ্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে এই প্রতিষ্ঠানটি অদূর ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হবে - এই আশাও রাখি। আরামবাগবাসীর গর্ব নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

# আমার সাতের দশকের নেতাজী মহাবিদ্যালয় ঃ এক গভীর স্মৃতি মেদুরতা

সুব্রত কুমার ঘোষ

স্মৃতির চশমার ঘোলাটে কাঁচটার মধ্যে দিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনেক দূর অতীতের ছবি দেখার চেষ্টা করছি। ছবিগুলো অনেকটাই অস্পষ্ট, ঘটনাগুলো অনেকটাই অধরা, তবুও সেই দূর অতীতের অজানা ক্যানভাসে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার ছবি আঁকার চেষ্টা করছি।

ঘটনার সময়কাল প্রায় পাঁচটি দশকেরও বেশি প্রাচীন। সালটা ১৯৭০, উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়ে স্নাতক হবার আশায় পা রেখেছিলাম হুগলীর আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে। স্থানটির নাম কালিপুর হলেও যা আমাদের কাছে আরামবাগ কলেজ নামেই পরিচিত ছিল। ছোট ছোট কয়েকটা ক্লাসরুম, একটি সামান্য বড় হলঘরের আকারের গৃহ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমনরুম, অফিস কক্ষ, কলেজ হোস্টেলের ছোট ছোট খড়ের ছাউনি দেওয়া ঘর, একটি খেলার মাঠ - এই নিয়েই ছিল তখনকার নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পরিসর। তবে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার অনুপাতে তা যথেষ্টই ছিল বলা যায়। মাসটা বোধহয় জুলাই হবে। যেদিন প্রথম ক্লাসরুমে পা রেখেছিলাম, ক্লাসটা ছিল বাংলার ক্লাস এবং অধ্যাপক ছিলেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মুরারী মোহন মান্না। পরে যখন জানলাম উনি নাট্যকার, অভিনেতা, তখন তো ওঁর অনুরাগীই হয়ে পড়লাম। অম্বুজবাবুর ক্লাসও খুব ভালো লাগত। একে একে ব্রজেশবাবু, রাধাগোবিন্দবাবুর ইতিহাস ক্লাস, সত্যব্রতবাবুর ইংরাজী ক্লাস, সিতাংশুবাবুর দর্শনের ক্লাস - সব ক্লাসেই পেলাম প্রাণের সাড়া। কলেজের কার্যকরী অধ্যক্ষ তখন পীযুষবাবু। পরে হয়েছিলেন দুলালবাবু। দু'জন অধ্যক্ষেরই স্নেহচ্ছায়ায় ও শাসনে নিজেকে সুরক্ষিত ভাবতে শুরু করলাম। কলেজের ক্লার্ক কৃষ্ণপদ সরকার ও সত্যেন পালও অফিস কক্ষে গেলে স্নেহের চোখেই দেখতেন। আর আমাদের খুব প্রিয় ছিলেন লাইব্রেরিয়ান অরুণবাবু (অরুণ গুপ্ত)। কলেজ লাগোয়া হোস্টেলে আমার স্থান হল না। আমি আরামবাগ শহরের মধ্যস্থলে (বাসুদেবপুর মোড়ের কাছে) হোস্টেলে স্থান পেলাম। ওই হোস্টেলের নাম ছিল নেতাজী টাউন হোস্টেল। বর্ধমান, বাঁকুড়া ও হুগলীর দূরবর্তী গ্রামের ছাত্ররাই মূলত স্থান পেয়েছিল ওই হোস্টেলে। একঝাঁক আঠারো-উনিশ বছরের ছেলেদের দাপাদাপিতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন প্রতিবেশীরা। আবার আমাদের পরোপকারী মানসিকতা পরে তাঁদের প্রশংসাও অর্জন করেছিল। আমরা প্রতিদিন সকাল দশটায় হোস্টেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে পায়ে হেঁটে আরামবাগ সদর ঘাটে পৌঁছে যেতাম এবং বর্ষাকালে সেখান থেকে নৌকা করে কালিপুর। গ্রীষ্মকালে বাঁশের তৈরি সাঁকো পেরিয়ে চলতো আমাদের যাতায়াত। তিনটি বছর একটানা এভাবেই পড়াশোনা, খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা এবং কিছুটা বয়স সুলভ দুষ্টুমি নিয়ে অতিক্রান্ত হল আমার

* প্রাক্তন ছাত্র

কলেজ জীবন। এই তিনটি বছর কত না ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা। সেই ঘটনাবহুল তিনটি বছরের এক চালচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

**সংস্কৃতি ঃ-** সাতের দশক ছিল বাংলা সিনেমার স্বর্ণযুগ। স্বর্ণযুগ ছিল যাত্রারও। নিজে স্কুল জীবন থেকেই নাটক, যাত্রার অনুরাগী ছিলাম। স্কুল জীবনেই লিখে ফেলেছিলাম কিছু যাত্রা, নাটক ও থিয়েটার। কলেজে গিয়ে অভিনয়, আবৃত্তির আরও বড় পরিসর পেয়ে গেলাম। আরামবাগের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হল। প্রথম বছরেই আরামবাগ রামমোহন হল সহ কিছু জায়গায় নাটকের অভিনয়ও করে ফেললাম। সব জায়গাতেই আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতাম। স্কুল জীবন থেকেই সিনেমা দেখতে ভালোবাসতাম, কিন্তু দেখার সুযোগ ছিল কম। তবে স্কুল জীবনেই উত্তম-সুচিত্রার 'সাগরিকা', 'হারানো সুর'-এর মতো সিনেমা দেখে ফেলেছি। টাউন হোস্টেলে থাকার সুবাদে পড়াশোনার অবকাশে সিনেমা দেখার সুযোগ হল বেশি। ছায়াবাণীতে অনেক বাংলা ছবি এবং জ্যোৎস্না সিনেমায় অনেক হিন্দী ছবি দেখে ফেললাম। মনে আছে ছায়াবাণীতে 'জীবনমৃত্যু', 'ফরিয়াদ', 'বালুচরী', 'প্রথম কদমফুল', 'পিতা পুত্র', 'ধন্যি মেয়ে'র মতো কালজয়ী বাংলা ছবিগুলো দেখেছিলাম। জ্যোৎস্না সিনেমায় দেখেছিলাম 'আন্দাজ', 'আরজু', 'ওয়াক্ত', 'ঝুক গয়া আসমান'-এর মতো হিন্দী ছবি। অধিকাংশ সিনেমাই আমরা দল বেঁধে দেখতাম নাইট শোতে। বলাবাহুল্য কারও অনুমতি ছাড়াই। তখন মনে হত ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে মুক্ত আকাশের স্বাদ পেয়ে গেছি। হোস্টেল লাইফ মানে বাঁধ ভাঙা উল্লাসের জোয়ারে ভেসে যাওয়া। কেউ বাধা দেবার নেই। কী আনন্দ - আকাশে বাতাসে!

আর এক আনন্দের বার্তা বহন করে আনতো কলেজের সোস্যাল। কলেজের বাৎসরিক এই অনুষ্ঠানের জন্য আমরা দিন গুনতাম। যেদিন সোস্যালের মঞ্চ বাঁধা হত, সেদিন বাঁধভাঙা আনন্দের জোয়ারে আমরা ভেসে যেতাম। ১৯৭০-৭২ এই তিন বছর স্বর্ণযুগের কিংবদন্তী সঙ্গীত শিল্পীরা কলেজ সোস্যাল মাতিয়ে দিয়েছেন। কে আসেননি ওই তিন বছরে - শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, পিন্টু ভট্টাচার্য্য, ললিতা ধর চৌধুরী, অমৃক সিং অরোরা, ইলা বসু, 'বালুচরী' ছবির নায়ক অজয় গাঙ্গুলী আরও কতজন যে এসে তাঁদের সঙ্গীত মাধুর্যে শ্রোতাকূলকে শিহরিত চমৎকৃত করে গেছেন তার কোনও সংখ্যা নেই। একবার অনুষ্ঠানের শেষে আরামবাগ শহরে সত্যব্রতবাবুর বাড়িতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ও চিত্রাভিনেতা অজয় গাঙ্গুলীর সঙ্গে আমাদের কয়েকজনের আড্ডা আর শ্যামল মিত্রর অনুষ্ঠান চলাকালীন কৈকালা সাবস্টেশনে বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ফলে ফাংশান পণ্ড হয়ে যাওয়ার ঘটনা মনের মধ্যে একেবারে টাটকা। কিছুদিন পর এক দুপুরে শ্যামল মিত্র একক সঙ্গীত অনুষ্ঠানে আরামবাগ কাঁপিয়ে দিয়ে গেছিলেন। সেদিনের সেই অনুষ্ঠানে

আমিও তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছিলাম শ্যামল মিত্রের অসাধারণ মেলোডি কণ্ঠ। সত্যি, এসব ভাবলে বড় স্মৃতি মেদুরতায় আক্রান্ত হই। আজ যৌবন অতিক্রান্ত হবার পর সেদিনের সেই স্বর্ণযুগের শিল্পীদের সোনাঝরা গানগুলি হৃদয়কে বারবার আবেগরুদ্ধ করে তোলে। মনে মনে ভাবি সেইসব শিল্পীদের কতই না সান্নিধ্যে এসেছিলাম সেই দিনগুলিতে। সৌজন্যে আমার প্রিয় সাতের দশকের নেতাজী মহাবিদ্যালয়। মনে আছে আরামবাগ বয়েজ ক্লাবের চ্যারিটি ফাংশানে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে আর অনুপ ঘোষাল এসেছিলেন। আমরা টাউন হোস্টেলের কয়েকজন ওই চ্যারিটি ফাংশানের ভলেন্টিয়ার হয়েছিলাম। একেবারে সামনে থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে-কে দেখার কি অসাধারণ অনুভূতি।

**ক্রীড়াক্ষেত্রে আমার নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সাফল্য ঃ** এবার আসছি ক্রীড়াঙ্গনে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সৃষ্ট ইতিহাস নিয়ে। তখন ফুটবলের যুগ। ক্রিকেট সেভাবে জনপ্রিয় হয়নি। "সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল" - এই গানটি যেন ফুটবলপ্রেমীদের হৃদয়ের গান হয়ে উঠেছিল। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের ফুটবল টিম মানে এক অপ্রতিরোধ্য একাদশ। আন্তঃকলেজ ফুটবলে তখন নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের জয়জয়কার। কলেজ ফুটবল ছাড়াও কলেজের ফুটবল টিম যেখানে খেলতে গেছে, সেখান থেকেই বিজয়ী ট্রফি নিয়ে ফিরেছে। ওই সময় অসংখ্য ফুটবল প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছিল। 'গিরিজা-বিশ্বজিৎ-আম্বিয়া' এই ত্রয়ী ফুটবল রত্নের পায়ের যাদুতে ফুটবল মাঠে সৃষ্টি হত বিদ্যুতের ঝিলিক। এঁদের সহ খেলোয়াড়রাও প্রতিদিন প্রতিটি ফুটবল মাঠে ফুল ফোটাতেন। কত নাম উল্লেখ করব, পরেশ ভাণ্ডারী, গণেশ অধিকারী, সুভাষ দত্ত, আশীষ সরকার, তপন সরকার, প্রশান্ত রায়, ক্ষুদিরাম, বিবেকানন্দ দত্ত - আরও অসংখ্য ফুটবলার তখন কলেজ টিমকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এই তিন বছরে কলেজে আমি ট্রফির পাহাড় দেখেছি। আজ যখন ফুটবলের এই দৈন্যদশা দেখি তখন বারে বারে মনে পড়ে নেতাজী কলেজের সেই ফুটবলারদের খেলা, যা দেখার জন্য মাঠে দর্শকের ঢল নেমে যেত আর নেতাজী কলেজের জয়ধ্বনিতে মাঠ মুখরিত হয়ে উঠত।

**কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঃ** প্রতি বছর নিয়ম করে কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচন হত। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ছাত্র পরিষদ (আদি), ছাত্র পরিষদ (নব), বি. পি. এস. এফ ও এস. বি। নির্বাচনের আগে কিছুটা রাজনৈতিক উত্তাপ সৃষ্টি হলেও নির্বাচনের পর স্তিমিত হয়ে যেত। নির্বাচনের আগে বিমান বসু, নুরুল ইসলাম প্রভৃতি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা প্রচারে আসতেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলি কোনদিন কলেজ প্রাঙ্গনে আমরা দেখিনি। নির্বাচনের পর নতুন ইউনিয়ন গঠনের পর আমরা ছাত্ররা পারস্পরিক সৌহার্দের বন্ধনে সারা বছর আবদ্ধ থাকতাম। সেই সময়ের ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা অনেক ছাত্রই পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে

আসীন হয়েছিলেন। আজ আমি এই ভেবে আনন্দিত যে, আমাদের কলেজের সেই ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা সমীর ভাণ্ডারি এখন আরামবাগ পৌরসভার মাননীয় চেয়ারম্যান।

**সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ ঃ** সাতের দশকের আমার কলেজ জীবন ছিল ঘটনাবহুল। নেতাজী টাউন হোস্টেল থেকে দেখেছি এক বিধ্বংসী বন্যার হাড় কাঁপানো দৃশ্য। বন্যায় অবরুদ্ধ হোস্টেল, যখন চারিদিক বন্যার জল বেষ্টিত, তখন আঠারো-উনিশ বছরের যৌবনের দুঃসাহসকে সঙ্গী করে আমরা সাঁতরে পৌঁছে গেছি দুঃস্থ প্রতিবেশীদের উদ্ধার করতে। আমাদের সামান্য সঞ্চিত খাদ্য থেকেও তাঁদের ক্ষুধার উপশমের চেষ্টা করেছি। বন্যার জল কমলে দেখেছি গড়বাড়ি মাঠে হেলিকপ্টারে করে খাদ্য সামগ্রী নিক্ষেপের দৃশ্য। দেখেছি হাজার হাজার মানুষের খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য ছোটাছুটি। কিছুদিন বাদে দেখেছি গড়বাড়ি মাঠে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হেলিকপ্টার থেকে অবতরণ। শুনেছি তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতা।

এই সময়কালের মধ্যেই ঘটেছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। আরামবাগের বুকেও আমরা তার আঁচ অনুভব করেছিলাম। ছোট পকেট ট্রানজিস্টার রেডিওতে শুনতাম স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত দেশাত্মবোধক গান। ১৯৭১এর ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দান থেকে মুজিবর রহমানের জ্বালাময়ী ভাষণ - ''ভাইসব, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। আমাদের দুরন্ত যৌবন বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতি হয়ে উঠেছিল গভীর সহানুভূতিপ্রবণ। এইসময় শুনেছিলাম বাংলা ভাষা আন্দোলনের সেই বিখ্যাত গান - ''আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি"। শুনেছিলাম - ''এক মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রনি"। গানগুলি এখন শুনতে পেলে সেদিনের সেই দিনগুলির স্মৃতি টাটকা হয়ে মনের কোণে ভেসে ওঠে।

তারপর বাংলাদেশ যেদিন স্বাধীন হল, সেদিন আমরা কলেজের সব ছাত্র-ছাত্রীরা উল্লাসে মেতে উঠেছিলাম। আমরা অধ্যাপকদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের এই জয়কে আমাদেরই জয় বলে মনে করেছিলাম। তবে সময় বড় তাড়াতাড়ি বিদায় নেয়, আমরাও তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স সম্পূর্ণ করে ফেললাম। যদিও সেই বারে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা অনেক বিলম্বিত হয়েছিল। শিক্ষা সম্পূর্ণ করে আমার প্রিয় কলেজকে বিদায় জানিয়ে আসতে চোখ একটু অশ্রুসিক্ত হয়েছিল বৈকি। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণের সাথী নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে যে আজ গভীর স্মৃতি মেদুরতায় ভরা।

তারপর কলেজ ছাড়লাম, উচ্চশিক্ষার জন্য অন্যত্র পড়তে গেলাম, শিক্ষক শিক্ষণ ডিগ্রি লাভ করার জন্য ভর্তি হলাম। শিক্ষা শেষে কাইতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলাম। শিক্ষকতার সাথে আমার অভিনয়ের সুযোগ আরও প্রসারিত হল। আকাশবাণী ও দূরদর্শনে দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ বছর যুক্ত

হলাম। অভিনয়ের খেয়ালে কিছু সিরিয়াল ও সিনেমাতেও অভিনয় করলাম। কিন্তু মনের মণিকোঠায় চির সমুজ্জ্বল রইল আমার নেতাজী মহাবিদ্যালয়। বহুবার এই কলেজের পাশ দিয়ে যাতায়াত করেছি। আর স্মৃতি মেদুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে চেয়ে দেখেছি আমার প্রিয় কলেজকে। আমার প্রিয় এই কলেজের ৭৫তম বর্ষপূর্তি উৎসবের স্মরণিকায় যখন লেখার প্রস্তাব পেলাম, তখন যারপরনাই উত্তেজিত ও আপ্লুত হয়েছিলাম। কারণ এত ঘটনার ঘনঘটা এই কলেজের সঙ্গে আমার জীবনে জড়িয়ে আছে, যা এই স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সত্যই দুরুহ। তবুও মাননীয় অধ্যক্ষ অসীমবাবু ও ইতিহাসের অধ্যাপক গোপালবাবুর সঙ্গে দূরাভাষে দীর্ঘ কথোপকথন কোলাজ আমাকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করেছিল। ভাবলাম কলেজের এই প্লাটিনাম জুবিলিতে যদি আমি এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে একটুও যুক্ত হতে পারি তবে নিজেকে ধন্য মনে করব। আমার প্রাণের এই কলেজ সম্বন্ধে আমার উপলব্ধি কতটা প্রকাশ করতে পারলাম তার বিচার পাঠক করবেন। আমি আমার নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের প্লাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। আর একজন প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি যে, এই কলেজ যেন আগামীদিনে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

অতীতে যেমন অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী এই কলেজ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশ ও সমাজের বুকে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, আগামীদিনেও এই কলেজের সেই সাফল্য যেন অব্যাহত থাকে। আগামীদিনেও এই কলেজ যেন অসংখ্য কৃতীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার গরিমা অটুট রাখতে পারে। পরিশেষে যে সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মী সেই সময়কালে কর্মরত ছিলেন এবং প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে রইল আমার অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা। যাঁরা এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন তাঁদের জানাই বিনম্র প্রণাম। কলেজের বর্তমান অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রী সকলকে শুভেচ্ছা, অভিনন্দন ও ভালোবাসা।

# সাতের দশকে কলেজের সাহিত্য-সংস্কৃতি

বিভাংশু দত্ত

আমি সাতের দশকের মাঝামাঝি সময় আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হই। তখন জরুরি অবস্থা চলছে। সারা রাজ্যে একটা চাপা সন্ত্রাসের চোরা স্রোত বয়ে চলেছে। কলেজে স্বৈরতন্ত্র না থাকলেও কংগ্রেসের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। সাতাত্তরে লোকসভা ও বিধানসভা দুটো নির্বাচনেই কংগ্রেস পর্যুদস্ত হয়। কিন্তু কী অদ্ভুত বৈপরীত্য ! কেন্দ্রে ও রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতাচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কলেজে কিন্তু কংগ্রেস তথা ছাত্র পরিষদের ক্ষমতা ও প্রভাব অটুট থেকে গেল। বরং অনেকটা উল্টো। রাজ্যশাসনে পালাবদল ঘটলেও এখানে সিপিএম তথা এসএফআই-এর কোনো প্রভাব খাটল না। বদলে ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠী সমানভাবে সক্রিয় ও শক্তিশালী থেকে গেল। তাদের ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারল না বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই।

অবশ্য আটাত্তরের শুরুতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্র পরিষদের অন্তর্বৈরিতা বা গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঘুচে গেল। ফলে দুই গোষ্ঠীই ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে এসএফআই-এর বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। যেটা বলছিলাম, রাজ্যে সিপিএম তথা বামফ্রন্ট ক্ষমতা কায়েম করলেও আরামবাগ পুরসভা, বিধানসভায় ছিল বাম বিরোধী জনতা পার্টির আধিপত্য। স্বভাবতই আমাদের কলেজেও এসএফআই-এর সংগঠন তেমন শক্তিশালী ছিল না। ফলত বাম আমলের শুরুতেও ছাত্র পরিষদই ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়ী হয়ে ছাত্র সংসদ অধিকার করে।

তাই, আমরা যেমন রাজ্যে কংগ্রেস আমলের শেষের সেদিনের সাক্ষী, তেমনই বাম শাসনেরও প্রথম কয়েক বছরেরও প্রত্যক্ষদর্শী। অবশ্য কলেজে যে ছাত্র পরিষদ ক্ষমতায় আসীন ছিল, সে কথা তো আগেই বলেছি।

পাঠক ভাবতে পারেন, আমি বোধহয় সাহিত্য-সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে রাজনীতির কথাই বলে চলেছি। আসলে সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির নিবিড় যোগ না থাকলেও শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শাসক দলের একটা প্রভাব থেকেই যায়, সব আমলেই। সে জন্যই সেই সময়কার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট একটু তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

আশার কথা এবং গর্বেরও কথা, আমাদের সময়ে আরামবাগ কলেজে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতির তেমন কোনও যোগ ছিল না বললেই চলে। সংস্কৃতির চর্চা রাজনৈতিক দল বা দলের মতাদর্শ মেনে করতে হয়নি। শিল্পীর স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করা হয়নি। স্বাধীনভাবে মুক্ত চিন্তা বিকাশের

* প্রাক্তন ছাত্র

একটা সুস্থ পরিবেশ ছিল।

তখন হাতে হাতে মুঠো ফোন ছিল না। গ্রামাঞ্চলে টিভির তেমন চল ছিল না। তাই, আমাদের সংস্কৃতি -চর্চার মাধ্যম ছিল কোনো মঞ্চ বা পত্রিকা। সে সময় কলেজে একটা দেওয়াল পত্রিকা ছিল। সেই দেওয়াল পত্রিকাতে লেখা দেওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছিল প্রবল উৎসাহ। এছাড়াও কলেজের বার্ষিক পত্রিকা 'উৎসর্গ' তো ছিলই। নিজের নামটা মুদ্রিত অক্ষরে সেই পত্রিকার পাতায় দেখতে পেলে নিজেদের তখন যারপরনাই গর্বিত ও ধন্য মনে করতাম। রাজনীতি নিয়ে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সে সময় তেমন আগ্রহ ছিল না। কাজেই আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গন অনেকটাই রাজনীতি নিরপেক্ষ ছিল। কী লেখায়, কী গানে, সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্য ক্ষেত্রেও এই ধারা বজায় থাকত।

তখন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি বিভাগে তিন ভাষা অর্থাৎ বাংলা, ইংরাজি ও সংস্কৃত-য় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হত। এখন এই তিন ভাষার সঙ্গে সাঁওতালি ভাষার সংযোজন ঘটেছে। সংগীত প্রতিযোগিতাতেও রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি তো ছিলই, দু-একবার অতুলপ্রসাদি, রজনীকান্তের গানেরও প্রতিযোগিতা হয়েছিল। এছাড়াও বিতর্ক, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, বসে আঁকো, প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা থাকত। প্রসঙ্গত বলে রাখি, তখন প্রায় প্রতি বছর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অধিকাংশ পুরস্কার পেত বর্তমানে আরামবাগ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মমতা মুখোপাধ্যায় (তখন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল)।

নবীন বরণ ও কলেজের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ ভূমিকা থাকত। বহিরাগত বিখ্যাত শিল্পীদের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব অনুষ্ঠানও থাকত। আমার এখনও মনে আছে, তখন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীত আমরা সমবেতভাবে গাইতাম। বেশ কয়েকদিন রিহার্সাল দেওয়ার পর মঞ্চে ওঠার সাহস হত। বহিরাগত নামী শিল্পীদের কাছে আমাদের কলেজের মান যেন বজায় থাকে, এ ব্যাপারে আমরা খুব সচেতন থাকতাম। তবে এ ক্ষেত্রে কোনও দলাদলি ছিল না, আমরা দলীয় পক্ষপাতিত্বের বিরোধী ছিলাম। সত্যিই যারা ভালো গান গাইত তাদেরকেই বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুযোগ দেওয়া হত। কে সিপি, কে এসএফআই এটা ভাবা হত না। এখনও মনে হয় সেই ধারাই বজায় আছে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পক্ষপাত না থাকাই বাঞ্ছনীয়। প্রসঙ্গত একটা দুঃখের কথা বলি। সে সময় আমরা যে কজন গান, আবৃত্তির আয়োজনে প্রায় সারা বছর মেতে থাকতাম, তাদের মধ্যে আবৃত্তিকার মদন বারিক ও সংগীত শিল্পী তপন ঘোষাল আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। অকালে তারা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

সে সময় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে রাজনীতির অনুপ্রবেশ অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ থাকায় ছাত্র সংসদের পদাধিকারী ছাত্র বা নেতাদের কোনো 'দাদাগিরি' ছিল না। বার্ষিক পত্রিকার ব্যাপারে কলেজ শিক্ষকরাই ছাত্রদের বলে দিতেন কে কোন্ বিষয়ে লিখবে। পছন্দ হলেই নির্বাচিত লেখাটা ছাপার জন্য প্রেসে পাঠানো হত

আর পছন্দ না হলে কোনো ছাত্রই কিছু মনে করতে পারত না। লেখা ছাপানোর জন্য কোনো প্রভাব কাজ করত না।

মোট কথা, আমাদের সময় সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে একটা নির্মল আনন্দ ছিল। সবাই ভেদাভেদ ভুলে দলমতনির্বিশেষে বিশুদ্ধ সাংস্কৃতিক চর্চায় মেতে থাকতাম। রবীন্দ্র জয়ন্তী, নেতাজির জন্মদিনেও আমরা এই ধারা ও কৌলিন্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছি।

আজ প্রায় অর্ধ শতক পরেও আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের সেই সোনালি দিনগুলোর কথা স্পষ্ট আমার মনে পড়ে। আমাদের অনেক স্যার ও সহপাঠী এই পৃথিবী ছেড়ে হয়তো চলে গেছেন। কিন্তু তাঁদের সেই ফেলে-আসা স্মৃতিচিহ্ন আজও আমাদের মানসপটে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মনে পড়ে পুরোনো বাড়ির নীচের হলগুলোতে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা বা অনুষ্ঠানের কথা। কানে আজও যেন শুনতে পাই কোনো পরিচিত কণ্ঠে গান বা আবৃত্তি। মনে হয় আমরা বোধহয় আবার আনন্দে গান আর আবৃত্তি করে চলেছি। খুব ইচ্ছে করে সেইসব দিনগুলোকে আর একবার ফিরে পেতে। আরো একবার সেইসব সাংস্কৃতিক বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার প্রবল ইচ্ছে জেগে ওঠে। যদি কোনোদিনও জাদুমন্ত্রবলে এক মুহূর্তের জন্যও তা সম্ভব হয় সেদিন সবাই মিলে মঞ্চে না হোক, সেই আম গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে সমবেতভাবে গেয়ে উঠব

“হায় মাঝে হল ছাড়াছাড়ি, গেলেম কে কোথায়
আবার দেখা যদি হল সখা
প্রাণের মাঝে আয়”।

## যা দেখেছি, যা পেয়েছি

আনন্দমোহন মুখার্জি

জগতে বস্তু-অবস্তু, জীব-জড়, যা কিছু আমাদের নয়নগোচর, সেগুলির বর্তমান অবস্থা জানতে হলে প্রশ্ন করতে হয় অতীতের ঘটনাবলীকে। সেটাই - ইতিহাস। জীবন প্রবাহিত হয় অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান হতে ভবিষ্যতের দিকে। জীবনকে জানতে হলে, জানতে হবে পৃথিবীপৃষ্ঠে তার অঙ্কুরিত হবার ইতিহাস। একটি জীবন প্রবাহিত হয়ে চলেছে একটি নদীর মতো চড়াই-উতরাই ভেঙে বিভিন্ন কর্মপ্রণালীর মধ্যে দিয়ে। বর্তমানে কেউ যদি প্রশ্ন করে 'কস্ত্বম'? উত্তর পেতে হলে চলে যেতে হবে তার শিক্ষা-দীক্ষার ইতিহাসে। উত্তর আসবে প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদি।

আমার জীবনের বর্তমান কার্যের মূলে যেসব প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, গুরু আছেন, যাঁদের থেকে পাথেয় অর্জন করে পথ চলছি, পৃথিবীপৃষ্ঠে খেয়ে পরে এর অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছি, সেই স্মৃতিপথে বিচরণ করতে গিয়ে দেখতে পাই সামন্তখণ্ড প্রাইমারি, সেকেন্ডারি স্কুল (গোঘাট), অঘোর কামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয় (বেঙ্গাই, গোঘাট), নেতাজি মহাবিদ্যালয় (কালীপুর, গোঘাট, যা বর্তমানে আরামবাগ পৌরসভার অন্তর্গত) এবং বায়োকেমিক ইনস্টিটিউশন ইত্যাদি। আমি একজন সৌভাগ্যবান, জন্মগ্রহণ করেছি তিনদিক ঘেরা মহাবিদ্যালয়ের মাঝে হুগলির গোঘাট থানার অন্তর্গত সামন্তখণ্ড গ্রামে। গোঘাট থানার তিনদিকে তিনটি মহাবিদ্যালয় শিক্ষার জ্ঞানালোকের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বে নেতাজি মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমে শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপিঠ (কামারপুকুর), মাঝে অঘোর কামিনী প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়, গোঘাট থানার অন্তর্গত। কামারপুকুর গ্রামে যুগাবতার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ধন্য আমি। শুনেছি এই তিনটি বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেন ডাক্তার রাধাকৃষ্ণ পাল, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন (আরামবাগের গান্ধী), ডক্টর বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। ওনাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত গোঘাট থানা শিক্ষার আদর্শ স্থান হিসেবে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। চোখের সামনে নেতাজি মহাবিদ্যালয়টি মহীরুহে পরিণত হয়ে ৭৫ বছরে পা রাখল, এ বছর ২০২৩ সালে প্লাটিনাম জুবিলি পালিত হতে চলেছে বিভিন্ন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। ওই মহাবিদ্যালয়ে আমি একদিন ছাত্র ছিলাম, সময়কাল হচ্ছে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১। মহাবিদ্যালয়ের তখন কিশোর অবস্থা বলা যেতে পারে। কি সুন্দর ছিল আমার এই মহাবিদ্যালয়টি। লোকালয় হতে বহু দূরে আশ্রমের মতো। নেতাজির মর্মর প্রতিমূর্তি স্থাপিত ভূখণ্ড, চারিদিকে অফিস, লাইব্রেরি, শ্রেণিকক্ষ, ল্যাবরেটরি দিয়ে ঘেরা একতল বিশিষ্ট সৌধাবলী।

* প্রাক্তন ছাত্র

কালিপুর থেকে বালিদেওয়ানগঞ্জ রাস্তার একটু দূরে ডানদিকে একটি রাস্তা দিয়ে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী পেরিয়ে মহাবিদ্যালয়ের ফটক উত্তর দিকে। ফটকের সম্মুখ দিকে একটি রাস্তা পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে অনতিদূরে শেষ হয়েছে। ওই রাস্তার পাশে ছিল পোস্ট অফিস। ওই অফিসে একটি ঘরে বিনামূল্যে ছাত্রদের জন্য হোমিও ওষুধ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, আমি যুক্ত ছিলাম। উত্তরদিক থেকে মহাবিদ্যালয়ের ফটকে প্রবেশ করেই ডানদিকে ছিল অধ্যাপকদের বসার অফিস, তারপর ছিল লাইব্রেরি, তারই ডানদিকে ছিল ছাত্রীদের বসার ঘর। ওই বিল্ডিং-এর সম্মুখে ছিল উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি। ফটকের বামদিকে ছিল কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ পশ্চিম হতে পূর্বে লম্বা, তারপর কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ উত্তর হতে দক্ষিণে লম্বা। তারপর এল-প্যাটার্নের পূর্ব হতে পশ্চিম লম্বা বড় বড় দুটি কক্ষ, তারপর ছিল দক্ষিণ দিকে আর একটি ফটক, সেটি দিয়ে যাওয়া যেত বিস্তীর্ণ খেলার মাঠে। দক্ষিণদিকের ফটকের ডানদিকে ছিল মহাবিদ্যালয়ের অফিসঘর। সেখানে ক্লার্ক, ক্যাশিয়াররা বসে কাজ করতেন। অফিসের ডানদিকে ছিল প্রিন্সিপালের বসার রুম। ঠিক তার ডান পাশে সরু পথ গিয়ে শেষ হয়েছিল লম্বা মাটির রান্নাঘরে। আলো-ছায়ায় ঘেরা, গুরু গম্ভীর পরিবেশে সকাল ন'টা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত চলত বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস। মহাবিদ্যালয়ে পড়ানো হত আর্টস, সাইন্স ও কমার্স। কলেজের উত্তর-পশ্চিম কোণে ক্যাম্পাসের বাইরে দুটি মাটির ঘর ছিল, সেগুলিতে অনার্সের ক্লাস চলত নিরালা নিঝুম পরিবেশে। মহাবিদ্যালয়ের উত্তরদিকে একটি বড় পুকুর তার পূর্ব পাড়ে ছিল কলেজের গার্লস হোস্টেল। দূর-দুরান্ত হতে আগত ছাত্রীরা ওখানেই থাকতো। মহাবিদ্যালয়ের পুব দিকে বয়ে চলেছে দ্বারকেশ্বর নদ দক্ষিণবাহিনী হয়ে। তার উপর দিয়ে চলত নৌকা। মহাবিদ্যালয় থেকে নৌকায় পেরিয়ে যাওয়া যেত ছোট্ট শহর আরামবাগে। আবার আরামবাগ সবজি বাজারের ফেরিঘাট হতে ছাত্র-ছাত্রীরা নৌকায় ৫ পয়সা ভাড়ায় পৌঁছে যেত আঢ্যদের পোড়ো ভিটের পাশে সরু রাস্তা দিয়ে মহাবিদ্যালয়ে। পড়াশোনা হতো 'ডে' ও 'নাইট' শিফটে। 'ডে' তে আর্টস ও সায়েন্স পড়ানো হতো, নাইটে পড়ানো হতো কমার্স। কমার্সের অ্যাকাউন্টেন্সি বিভাগের খুব সুনাম ছিল। দূরদুরান্ত থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা আসতো অ্যাকাউন্টেন্সিতে অনার্স পড়ার জন্য।

আমাদের সময় কার্যবাহী প্রিন্সিপাল ছিলেন অধ্যাপক দুলালচন্দ্র মাল মহাশয়। উনি ছিলেন খুবই ছাত্র দরদী। বিভিন্ন বিষয়ে ওনার ছিল গভীর জ্ঞান। নিজের বিষয় পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়াতেন খুব প্রাঞ্জলভাবে। কিছুদিন পর স্থায়ী প্রিন্সিপাল হিসেবে যোগ দেন অধ্যাপক সনৎ ভট্টাচার্য মহাশয়। উনি খুবই গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ও সুযোগ্য প্রশাসক ছিলেন। বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকরা ছিলেন অত্যন্ত ছাত্র বৎসল, কোমল-কঠোর ব্যক্তিত্বের জ্ঞানীগুণী মানুষ, যাঁদের চরণতলে বসে দূরদুরান্ত হতে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ গ্রহণ করত। তখন একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাসও মহাবিদ্যালয়ে হত। পাসকোর্স ও অনার্স পড়ানো হতো। আমাদের সময় অনার্স ছিল তিন বছরের এবং পাস কোর্স ছিল দু'বছরের। মহাবিদ্যালয়ে পড়ানো হতো বাংলা, সংস্কৃত, দর্শন,

গণিত, জুলজি, পলিটিক্যাল সায়েন্স ও অ্যাকাউন্টেন্সি বিষয়ের অনার্স। আমাদের সময় দু'জন মাতৃসমা অধ্যাপিকা ছিলেন। দর্শনের অধ্যাপিকা রীতা দুবে ও অধ্যাপিকা অনিন্দিতা চৌধুরী। ওনারা খুবই ছাত্রদরদী ও গভীর জ্ঞানের অধিকারিনী ছিলেন। অধিকাংশ ছাত্ররাই পরতো পাঞ্জাবি-পায়জামা এবং ছাত্রীরা পরতো নীলপাড়যুক্ত সাদা শাড়ি ও নীল জামা। অল্প কিছু ছাত্র পরতো প্যান্ট-শার্ট।

অধ্যাপকরা বলতেন, আগে মানুষ হও, শিক্ষার গুরুত্ব বোঝো। কারণ তোমাদেরকে একদিন শিক্ষাদান করতে হবে। বলতেন, তোমরা হচ্ছো সমাজের মেরুদণ্ড। অধ্যাপকেরা কি জ্ঞান-গম্ভীর বক্তৃতা দিতেন - প্রতিটি বিষয়ের গোড়ার ইতিহাস থেকে বর্তমান পর্যন্ত। আমি মনোযোগ সহকারে শুনতাম ও মন ভরে যেত। অধ্যাপকেরা বিভিন্ন বিষয়ে লেখার মধ্যে স্ট্যান্ডার্ড খুঁজতেন, নম্বর যেন হাত থেকে পড়তে চাইতো না। তাতে আমাদের পড়াশোনা ভালো করার আগ্রহ আরো বেড়ে যেত। তখনকার দিনে সাব্জেক্টিভ থটের পঠন-পাঠন বেশি ছিল। ইদানীং দেখতে পাচ্ছি ছেলেরা অনেক বেশি নম্বর পায়। কারণ এখনকার শিক্ষা প্রণালী অবজেক্টিভ থটের উপর নির্ভরশীল।

নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হতো। সরস্বতী পুজো, বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নবীন বরণ, বিদায় সম্ভাষণ, ফুটবল প্রতিযোগিতা, স্বাধীনতা দিবস, নেতাজির জন্মদিন পালন হত খুব ঘটা করে। এছাড়া দুটি ট্রেনিং ক্লাস হত। এন. সি. সি. ও এন. এস. এস. এবং বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প হত কয়েকদিনের জন্য। আমি যাঁদের কাছে পিতৃবৎ ভালোবাসা পেয়ে ধন্য হয়েছি তাঁরা হলেন পূজ্যপাদ অধ্যাপকবৃন্দ নিখিলচন্দ্র রায়, দুলালচন্দ্র মাল, রমাপ্রসাদ ঘোষ, সিতাংশু দত্ত, অম্বুজ বসু। প্রসঙ্গত বলা যায় যে অম্বুজ বসুর জীবনানন্দ দাশের উপর বিখ্যাত বই 'একটি নক্ষত্র আসে' আমাদের সময় প্রকাশিত হয়েছিল। ওনারা আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তাঁদের যত্নে লালিত হয়ে জ্ঞানের যে ছিটে-ফোঁটা গ্রহণ করেছি, তা দিয়ে আমার জীবনের পথ পরিক্রমা চলছে বন্ধুর পথে। সেইসব ঋষিতুল্য অধ্যাপকেরা অনেকেই ইহধামে নেই, মর্মাহত হৃদয়ে তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করি। তাঁদের মন-প্রাণ দিয়ে তৈরি প্রতিষ্ঠান নেতাজি মহাবিদ্যালয় তাঁদের অমরত্ব ঘোষণা করে তর-তর করে এগিয়ে চলেছে আগামী প্রজন্মকে অতীতের অর্জিত জ্ঞান প্রদানের নতুন বার্তা নিয়ে - অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ স্থাপনের জন্য।

ইদানীং কালের অনেক পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক-অধ্যাপিকা নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। তাঁদের সবার সাথে আমার পরিচয় নেই। তবে কর্মসূত্রে একজন অধ্যাপকের সাথে পরিচিত হয়ে বুঝতে পারলাম যে, শিক্ষার মানদণ্ডে আমার সাধের শিক্ষায়তনটিকে গুণান্বিত করতে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের অবদান অসামান্য। যে অধ্যাপকের কথা বললাম, তিনি হলেন গোপালচন্দ্র সিনহা। আমার সেই পুরাতন মহাবিদ্যালয় আকাশচুম্বি সৌধমালায় সজ্জিত হয়ে বর্তমান প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ডক্টর অসীম কুমার দে মহাশয়ের পৌরোহিত্যে 'একদিনের

ঝিরঝিরে নদী' আজ মহাসমারোহে সাগর সঙ্গমে চলেছে, তা দূর থেকে দেখে আমার হৃদয় বিগলিত, আনন্দিত। জয় হোক নেতাজি মহাবিদ্যালয়ের। নেতাজির মতো শৌর্যে-বীর্যে গর্জে উঠুক এবং আগামী প্রজন্মকে শিক্ষাদান করুন বর্তমান ও ভবিষ্যতের অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা যুগ-যুগান্তর ধরে। কালের যাত্রায় চলে যেতে হবে একদিন। কিন্তু মহাবিদ্যালয়টি অযুত-নিযুত বৎসর ধরে পুরাতন এবং নতুনের সমন্বয় সাধন করে নতুন পথের সন্ধান দেবে - এই আশা রেখে ইতি টানলাম।

# যেটুকু মনে পড়ে
উত্তম কুমার দত্ত

১৯৮৩-১৯৮৫। তারপর আর ভিতরে ঢোকার সুযোগ হয়নি। বাসের জানলা দিয়ে তাকিয়েছি কখনও-সখনও। বাইরের রূপ দেখে অবাক হয়েছি। কী সুন্দর শ্বেতশুভ্র, ঝকঝকে, নির্মেদ চেহারা! এক কথায় খাসা চেহারা। ভিতরে ঢুকলাম ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। দু'চোখ ভরে দেখলাম - আমাদের নেতাজী মহাবিদ্যালয়। মুগ্ধ হলাম।

সুযোগটা এল কলেজের বাংলা বিভাগের পুনর্মিলন অনুষ্ঠান, প্লাটিনাম জুবিলি, সেইসঙ্গে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'-এর অনুষ্ঠানে প্রাক্তনী হিসাবে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানালেন অধ্যাপিকা আভা দে ম্যাডাম ফেসবুকে। প্রাক্তনী হিসাবে দু'চার কথা বললাম। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' বই-এর ১০০ বছর, তাই দুটো ছড়াও বললাম। তার আগেই বাংলা বিভাগের ভাই-বোনেরা বরণ করে নিল। অনুষ্ঠান দেখলাম, শুনলাম। অধ্যক্ষ ড. অসীম কুমার দে, উপাধ্যক্ষ ড. বিশ্বনাথ গরাই, অধ্যাপক উদয় কুমার নন্দী, বাংলার বিভাগীয় প্রধান সুমিতা রানী দাস, ড. অর্চন চট্টোপাধ্যায়ের কথা শুনলাম। 'বাংলা ভাষার সংকট ও সমাধান' নিয়ে বলছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপিকা অরুণিমা চট্টোপাধ্যায়। অল্প কথায় সুন্দর উপস্থাপনা। বেশ ভালো লাগল। অনুষ্ঠান শেষে পরিচয় করলাম। শেষে ভূরিভোজ। কাঁধের ব্যাগে মিষ্টির প্যাকেট। আর যেটা না হলে অনুষ্ঠান অসম্পূর্ণ থেকে যায়, মোবাইলে নানা পোজে ছবি তুলে বাড়ি ফিরলাম।

আভা ম্যাডাম বলেছিলেন, বাংলা বিভাগটা একবার দেখে যাবেন। একটা দুর্নিবার টান অনুভব করছিলাম। ক'দিন পরেই হাজির হলাম। চোখে পড়ল অপূর্ব দেওয়াল চিত্র, দেওয়াল পত্রিকা। সুমিতা ম্যাডাম, আভা ম্যাডাম, পীযূষবাবু দেখলাম কী সব কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তার মাঝেই কী আন্তরিক আপ্যায়ণ। প্লেট ভর্তি মিষ্টি, জিলিপি। একটাও ফেলে রাখিনি। চা খেতে খেতে টুকটাক কথা-বার্তা পরিচয় হল রাজকুমার স্যার, কৃষ্ণ স্যার, পীযূষ স্যারের সঙ্গে। অধ্যাপক প্রদীপ কুমার পাল, অধ্যাপিকা মমতা খান সেদিন ছিলেন না। ওনাদের সঙ্গে অনেক আগেই পরিচয় হয়েছিল। ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, আলমারি ভর্তি বই। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল যেটা, তা হলো বাংলা বিভাগ যেন একটা হাসিখুশি যৌথ পরিবার।

কৃষ্ণ স্যার পুরো কলেজটা - প্রতিটা বিভাগ সঙ্গে নিয়ে দেখালেন। গ্রন্থাগার দেখে বিস্মিত হলাম। শুনলাম ষাট হাজার বই আছে। আমাদের সময় উত্তর দিকের ডানপাশে ছিল স্টাফ রুম। তার পাশেই গ্রন্থাগার। এখন সেখানে বিজ্ঞান বিভাগের ল্যাবরেটরি। একটা বই পেতে ডিমান্ড স্লিপ জমা দিতে হতো। আজ সেখানে

* প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ

ষাট হাজার বই! এতো বড় গ্রন্থাগার ক'টা কলেজে আছে! চোখে পড়ল রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তি - "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবতার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাধা পড়িয়া আছে।"

অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষের কক্ষ পার হয়ে স্টাফ রুম পেরিয়ে নীচে এলাম। আরে এই তো সেই আমগাছ! যার বেদিতে বসে শান্তি, অমল, পাপিয়া, রীনা, অনুজ্যোতি, অসীমা আর আমি গুলতানি মারতাম, স্বপ্ন দেখতাম, দেখাতাম। এখন কলেজ ক্যাম্পাস গাছ-গাছালিতে ভর্তি, অন্যদিকে সুদৃশ্য বাগান। নেতাজীর আবক্ষ মূর্ত্তি তখনও ছিল। ক্যাম্পাসের পশ্চিমদিকে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পালের আবক্ষমূর্তি দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত হল। ঐ তো পুবদিকের একতলায় বিশাল রুম। এখানে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাস হতো। মনে পড়ল অধ্যাপক ড. দুলালচন্দ্র মাল, ড. প্রণব কুমার দালাল, ড. শক্তি মান্না, ড. কার্তিক মণ্ডল স্যারের কথা। D. M. স্যারকে খুব মনে পড়ে। ক্লাসে এসে টেবিলের উপর পা ঝুলিয়ে বসতেন। শুধু জেনে নিতেন কোথায় পড়াচ্ছিলেন, কী পড়াচ্ছিলেন। তারপর বলতে শুরু করতেন। যেন গল্প বলছেন! আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম। P. K. D. স্যার শান্তিনিকেতনী ঘরানার সৌখিন মানুষ। ওনার পড়ানোর ধরণটা আলাদা - টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে পয়েন্ট ধরে ধরে আলোচনা করতেন ঘরোয়া ভাষায়। আমরা খাতায় টুকে নিতাম। সেটাই পরীক্ষায় লিখতাম। K. M. স্যার শান্তশিষ্ট, মিতবাক মানুষ। উনি বেশ নীচুস্বরে বলতেন। ভালোই লাগত। S. M. পড়াতেন নাটকীয় ভঙ্গিতে উঁচু স্বরক্ষেপণে।

কৃষ্ণ স্যার বললেন, আসুন। এক মিনিট দাঁড়ান। এখানটায় তো আমরা ফিলজফির ক্লাস করতাম। অধ্যাপিকা রীতা দুবে (R. D.), অনিন্দিতা ভট্টাচার্য (A. B.), অধ্যাপক সিতাংশু কুমার দত্ত (S. K. D.), অধ্যাপক বিমলেন্দু সামন্ত (B. S.) পড়াতেন। তখন ম্যাম বলার রেওয়াজ ছিল না। দিদি বলতাম। রীতাদি ভারতীয় দর্শন পড়াতেন। কী মিষ্টি কণ্ঠস্বর! কী সুন্দর উপস্থাপনা! অনিন্দিতাদি পড়াতেন সাইকোলজি, বিমলেন্দু স্যার পড়াতেন লজিক, সিতাংশুবাবু পড়াতেন পাশ্চাত্য দর্শন। S. K. D. ধুতি-ফতুয়া পরতেন। পান চিবোতে চিবোতে পড়াতেন। পড়ানোর সময় হাতে এক এক রকম মুদ্রা ফুটে উঠতো। আমরা হাসতাম। নকল করতাম। খুব সহজ করে বলতে পারতেন। মাঝে মাঝে নাটকের কথা বলতেন - "নাটক শিখবি? আমার কাছে আসিস। নাটক-যাত্রা এক নয়। আমার নাটকের দল আছে - শতাব্দীর কৃষ্টি দল।" আমি আর শান্তি ঐ দলে ভিড়েছিলাম।

মন খুঁজছে কলেজের পিছনে দক্ষিণদিকে একটা খড়ের চালের ছোট্ট ঘর। এসে দেখি সেখানে লম্বা তিনতলা বিল্ডিং। এখন যেখানে শারীরশিক্ষার ক্লাস হয়। হ্যাঁ, এখানেই আমাদের বাংলা অনার্সের ক্লাস হতো।

এক লহমায় সব সিনেমার ছবির মতো ভেসে উঠল চোখের সামনে। এই ছোট্ট স্যাঁতস্যাঁতে ঘরটাতেই আমরা ন'জন। আমি, শান্তি, অমল, রীনা, পাপিয়া, অনুজ্যোতি, ঝর্ণা, অসীমা আর বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের স্পেশাল অনার্স ছিল। আমরা ঠাট্টা করে বলতাম 'নবরত্ন সভা'। তখন ১৯৮৩। বাংলার বিভাগীয় প্রধান ড. অম্বুজ বসু। উনি অ্যাডমিশন টেস্ট চালু করলেন। মনে আছে প্রায় ৭০-৮০ জন পরীক্ষায় বসেছিলাম। রেজাল্ট বেরোতেই চক্ষু চরকগাছ। মাত্র আটজন - আটে অষ্টবসু যেন। রীনার নাম সবার উপরে, আমি সবার নীচে। কেমন করে জানি না, প্রথমের সঙ্গে অষ্টমের বন্ধুত্ব জমে উঠল। রীনা নীচুগলায় কম কথা বলত। অনুভব শক্তি জোরালো। ঝর্ণা আর অনুজ্যোতি বকবক করত খুব। পাপিয়া বেশ সুন্দরী। খিলখিলিয়ে হাসত। অসীমা সারাদিনে একটা-দুটো কথা বলত। কেমন ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। অমলের ঠোঁটে লেগে থাকত এক চিলতে হাসি। ভালো ছেলে, ভালো বন্ধু। শান্তি সৌম্য সুন্দর! নাটক পছন্দ করত। আমি টুকটাক লেখালেখি করতাম, আবৃত্তি করতাম। একবার হয়েছে কি আবৃত্তি করতে উঠে কিছুটা বলার পর ভুলে গেলাম। লজ্জার শেষ নেই। বন্ধুরা প্যাঁক দিতে ছাড়েনি। রীণা বলেছিল, পরেরবার চেষ্টা কর। হ্যাঁ, পরেবার শোধ নিলাম। মনে আছে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রস্তাব' আবৃত্তি করে ফার্স্ট হলাম। কিন্তু পুরস্কার, শংসাপত্র নেওয়া হয়নি। কেন, তা আজ আর মনে নেই। আপশোসটা থেকে গেছে। বিচারকদের মধ্যে একজন ছিলেন অধ্যাপক রবীন আদক। পরে জেনেছিলাম, উনি একজন কবিও।

রবীনবাবুর কথা একটু বলি। গৌরকান্তি, শ্বেতশুভ্র কেশ, গোঁফ-দাড়ি কামানো, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। মিতবাক্ মানুষ। একবার কী প্রসঙ্গে বলেছিলেন - ''কবি তো যত সুন্দর করে বলা যায়, কবিতার মধ্যে বলেছেন। তার আবার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ কী!'' তখন বুঝিনি। এখন কিছুটা বুঝি - কবিতা বোঝানোর জিনিস নয়, বাজানোর জিনিস। উনি খুব মার্জিত রুচির মানুষ। পড়াতে গিয়ে 'নীলদর্পণ' নাটকের অশ্লীল সংলাপ (সংলাপ কি শ্লীল-অশ্লীল হয়?) উচ্চারণ করতে পারেননি। অকপটে বলেছিলেন - আমি বলতে পারব না, পড়ে নিও। অধ্যাপক অম্বুজবাবুর সংস্পর্শে এসে পৃথিবীটাকে নতুন করে চিনলাম। নিজেকেও জানলাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প পড়াতেন। জীবনানন্দ পড়াতেন। পড়ে বুঝেছি একেবারে মৌলিক বিশ্লেষণ। একদিন লাইব্রেরিতে একটা বই দেখলাম 'একটি নক্ষত্র আসে'। জীবনানন্দের উপর স্যারের লেখা। পড়েছিলাম। চিনেছিলাম জীবনানন্দকে, ওনাকেও। উনি আমাদের ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, চন্দ্রশেখর পড়িয়েছিলেন। মনে হতো কী না জানেন! যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, সংস্কারমুক্ত মানুষ। স্যার শ্যামসুন্দর বীট - খুব সুন্দর করে বলতে পারতেন। বিশেষ করে ওনার রবীন্দ্রনাথ পড়ানো আজও মনে আছে। হাসিখুশি প্রাণখোলা মানুষ। এক সঙ্গে দুটো করে ক্লাস নিতেন। আমরা হাঁ করে শুনতাম। বেশ কয়েকবার ওনার বর্ধমানের বাড়িতেও আমরা দল বেঁধে হানা দিয়েছি। অধ্যাপক মুরারি মান্না - মনে পড়ে ওনার বৈষ্ণব পদাবলী ও 'শ্রীমধুসূদন' নাটক পড়ানো। অভিসারিকা

রাধার বর্ণনা তো এখনও চোখে ভাসছে। অধ্যাপক রমাপ্রসাদ ঘোষ (R. P. G) খুব ভালো মানুষ। পড়াতে পড়াতে প্রাণখোলা হাসতেন। বীরাঙ্গনা কাব্য পড়াতেন। উনি ওনার মেয়ের নাম রেখেছিলেন বীরাঙ্গনা। খুব মনে পড়ে ওনার 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' পড়ানো। কাম ও প্রেমের পার্থক্য কী সুন্দর বুঝিয়েছিলেন! তাই হয়তো ভবিষ্যত জীবনে গোলমাল কিছু হয়নি।

সব মনে পড়ছে এক এক করে। যখন ভর্তি হলাম তখন অধ্যক্ষ ড. সনৎ ব্যানার্জী। পরে অধ্যক্ষ হিসাবে পাই ড. বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়কে। দৃঢ়চেতা, কড়াধাতের মানুষ বলে শুনলাম। নিয়মনিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপরায়ণ মানুষ। এসেই পঁচাত্তর শতাংশ উপস্থিতি না থাকলে পরীক্ষায় বসতে দেবেন না বলে ফরমান জারি করলেন। কলেজের উন্নয়নের ভিতটা শক্তপোক্ত করলেন। ১৯৮৫ তে কলেজ থেকে অনার্স পাশ করে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলাম। ১৯৮৭ তে এম.এ পাশ করে চাকরির জন্য হন্যে হলাম। বর্তমানে বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে বাংলা পড়াই। ২০২৩, ৩১ জুলাই অবসর। ঐ তারিখেই নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পঁচাত্তর বছর পূর্তি।

এরমধ্যে দ্বারকেশ্বর দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বাসের জানলায় চোখ রেখে অবাক বিস্ময়ে যা দেখেছিলাম - আমাদের প্রিয় কলেজ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করতেই একরাশ মুগ্ধতা ঘিরে ধরল। কলেজ বিল্ডিং, প্রশাসনিক ভবন, অডিটোরিয়াম, ছাত্রাবাস, ছাত্রীনিবাস, সুবিশাল লাইব্রেরি, নতুন নতুন বিভাগ, ল্যাবরেটরি, সবুজের সমারোহ - মুগ্ধ করল আমাকে। প্লাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ড. অসীম কুমার দে মহাশয় বললেন - 'অনেককিছুই না পারা থেকে গেছে। এ বিষয়ে সকলের পরামর্শ চাই।' শুনে ভালো লাগল। উপাধ্যক্ষ ড. বিশ্বনাথ গরাই-এর গলাতেও সেই একই সুর। ফেরার পথে দেখা হল ইতিহাস বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. গোপালচন্দ্র সিনহার সঙ্গে। উনি আমার পূর্ব পরিচিত। হাসতে হাসতে বললেন, কেমন দেখলেন? আমি বললাম, এ তো ইউনিভার্সিটি!

# নস্টালজিয়া
## ড. তৃপ্তি কুণ্ডু রায়

রে রে করে তেড়ে এলো কালবৈশাখী। এই এক জ্বালা। বিহারীকে ডেকেও সাড়া পাওয়া যায় না। বুঝি ভাত-ঘুম দিচ্ছে। কিন্তু চিলেকোঠার জানালাগুলো না বন্ধ করলে আওয়াজে টেকা যাবে না। ছুটে যাই আগে। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে রুদ্ধশ্বাসে চিলেকোঠায়।

- ও মা গো! জোর লাগলো পায়ে। মরে গেলাম গো। বিহারীকে কবে থেকে বলেছি ঘরটা একটু পরিষ্কার করে রাখিস। কে শোনে কার কথা। ট্রাঙ্কের ধাক্কায় গেল পা-টা থেঁতলে। মরচে পড়া ঢাউস ট্রাঙ্কটাতে কি যে রেখেছিলাম মনেও করতে পারি না। খুলে দেখি তো একবার।

ক্যাঁচড়-ম্যাচড় করতে করতে নড়ে চড়ে কোনোরকমে চাপ হয়ে বসে যাওয়া বন্ধ ঢাকনাটা খুলে গেল চিচিং ফাঁক মন্ত্রে। ঢাকা খুলে যেতেই শুধু ধুলো, ঝুল আর মুচমুচে হয়ে যাওয়া পুরনো খবরের কাগজ সরিয়ে হাতে এলো ফ্রেমে বাঁধানো ছবির রাশ। একের পর এক। আঁচল দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছে পরিষ্কার করে নিতেই চোখের সামনে যেন জ্বলে উঠলো লক্ষ মাণিক। চোখের সামনে ভেসে উঠছে ফ্রেম-বন্দী কতো স্মৃতি, কত মুহূর্ত।

- ওই তো আমাদের প্রিন্সিপাল বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ স্যার। সেই ঝকঝকে হাসি মাখা উজ্জ্বল মুখ। যেন ডেকে উঠবেন এক্ষুণি - তৃপ্তি...। আরে ওই তো নক্ষত্রের মুখ। ভাস্বর, স্থিতধি, মুনিপ্রবর - ''একটি নক্ষত্র আসে''র স্রষ্টা আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যার অম্বুজ বসু। আরামবাগের ''ভালো মানুষ''। মানুষ কী? মানুষ হলে তো দোষ-গুণে পরিপূর্ণ হতেন। কিন্তু স্যারের দোষ? কী জানি। আমি জানি না তো। কেউ কি জানেন? লেন্স দিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় কী? না, না। কেউ পাবে না।

ঋষির মগ্নতায় উনি পড়িয়ে চলেছেন। আত্মমগ্ন আমরা। শুনছি। ইতিহাস আঁকছি - জানতাম না সেদিন। আজ জানি। ওনার ছত্রছায়ায় আসা মানেই ইতিহাসের এক উজ্জ্বল মুহূর্তের সাক্ষী থাকা। হে মহাজীবন - অনেক মানুষ তো তুমি উপহার দিলে আমাদের। কিন্তু এমন মহাপ্রাণ, অহংকার হীন, শুদ্ধ আত্মার মানুষ তুমি আর কী দিতে পেরেছো আমাদের? মহাকাল নির্বাক।

পটের পরিবর্তন হয়েই চলেছে। আরো একটি পট তুলে নিলাম হাতে। ধুলো মুছতে মুছতে শ্রদ্ধায় নত হয়ে গেল আমার মাথা। ''আদিগন্ত প্রবাস''-এর কবি, ''দেশ''-এর কবি অমলিন রবীন আদক। সেই আপোষহীন ঋজু ব্যক্তিত্ব। নিজের মতোই অমলিন ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি-ধুতি পরিহিত। একশো ভাগ

* প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ, বর্তমান কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্যা

বাঙালিয়ানার ছাপ তাঁর সবকিছুতেই। ছিমছাম, টিপটপ। পড়িয়ে চলেছেন, ''রাধার কী হইলো অন্তরে ব্যথা''। যেন কণ্ঠ দিয়ে ছবি আঁকছেন - পূর্বরাগের, রাধার, রাধার ব্যথার, রাঙা বাসের, ময়ূর-ময়ূরীর নীল কণ্ঠের, বৃন্দাবনের, গোপবালার, বৃষভানু সুতার। সকালের সম্ভাবনায় পুব আকাশে লাল সূর্যের রাঙা আবির ছড়িয়ে ছড়িয়ে পূর্বরাগের ভাবগম্ভীর আবেশ আঁকতে আঁকতে চলেছেন সেই প্রজ্ঞাময় ব্যক্তিত্ব। সেই স্নেহ, সেই আন্তরিকতা, সেই স্মিত ভাষ্য, হাস্য - মনে পড়ে যাচ্ছে। পড়ে যাচ্ছে চোখের জল মুক্তোর মতো উজ্জ্বলতায়। ভীষণ স্নেহ করতেন আমাকে। স্মৃতি সতত সুখের। কিন্তু এই স্মৃতির উজ্জ্বলতা অনেক অনেকগুলো সুখের রাশির যোগফল। থরথর হাতে নামিয়ে রাখছি সেই স্মৃতি মেদুর পট।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো স্যার মুরারী মোহন মান্নার মুখ। বেঁটে-খাটো, শ্যামবর্ণ, সাধারণ চেহারা, অসাধারণ পাঠ দান ক্ষমতা, আমাদের সম্মোহিত করে ফেলার ম্যাজিক তাঁর প্রতিটি মুদ্রায়। ভেসে আসছে ''কর্ণ কুন্তি সংবাদ''। স্যার ধ্যান গম্ভীর কণ্ঠে পড়িয়ে চলেছেন - ''সন্ধ্যা জাহ্নবীর বন্দনায় আছি রত, কর্ণ নাম যার; অধিরথ সূতপুত্র, রাধা গর্ভজাত ...''। কণ্ঠের জীয়ন কাঠিতে ক্রমশ জাগিয়ে তুলছেন আশা-নিরাশার চাপান-উতোর। কণ্ঠা কোথাও উত্তেজনায় টানটান, বেদনায় থরথর, দীর্ঘশ্বাসের ইংলিশ চ্যানেল পার করে চলেন চোখের তারায় চিকচিকে জল লুকোতে লুকোতে। উপসংহার আঁকেন। যেন নাট্যমঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা এক কুশীলব। - হাত জোড় করে, বই সরিয়ে রেখে, কণ্ঠ জুড়ে কী ভীষণ বেদনার ঘন হওয়া বাষ্প। এক ট্রাজিক নায়কের করুণতম চরম পরিণতির উচ্চারণ ''আমি রব নিস্ফল হতাশের দলে'' - স্তব্ধবাক মুহূর্ত, পল, ক্লাসরুম, নিঃশ্বাস।

পরের ছবিটা ধুলো ঝেড়ে কোলে তুলে নিলাম পরম মমতায়। রমাপ্রসাদবাবু। উনি এখন আমার দুই হাতে ধরা নীরব এক অতীত। ভালো মানুষের আক্ষরিক সংজ্ঞা যেন। ধীর-স্থির হাসিমুখের এক মানুষ। পণ্ডিত, বিদগ্ধ একজন। ক্যাম্পাসের বাইরে মাঠের পাশে সারি সারি তিন-চারটি খড়ের চালার একটাতে উনি ক্লাস নিতেন, নোট দিতেন। খড়ের চালার কথা বলতেই আজকের বর্তমান যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে গেল। বর্তমান হাসল অতীতের খড়ের চালার দৈন্যতায়। কিন্তু আজকের নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণযুগ যেমন সত্যি, সেইরকম খড়ের চালার ইতিহাসের স্মৃতিও খুব সত্যি। যেমন সত্যি নদীর পারে আঢ্যদের ঘরে প্রথম কলেজের পঠন-পাঠনের অতীত-গাথা। ওই বাড়িতেই কলেজের পঠন-পাঠনের পত্তন। আমাদের শিল্পগুরু হরিপ্রসাদ মেদ্দার কাছে আজও শুনি আঢ্যদের বাড়িতে ক্লাসরুমের কথকতা। ওনারা কয়েকজন ছিলেন কলেজের প্রথম দিকের ছাত্র। উনি সেই ইতিহাসের বাঙ্ময় কথাকার। আমাদের একটা দুঃখ ছিল - আমাদের বাংলা বিভাগের কোনো ম্যাডাম ছিলেন না। ফিলোসফির রীতা দুবের সুন্দর স্নেহমাখা মুখ, অনিন্দিতাদির মুখের ব্যক্তিত্বের ছাপ, জুলজির অনিতাদির নিপাট বন্ধুত্ব কলেজ ক্যাম্পাসে যেন রঙ ছুঁইয়ে যেত।

হঠাৎ কড় কড় করে বাজ পড়লো কোথাও। চমকে উঠলাম। হাত থেকে ছবিটা পড়ে যাবার উপক্রম। তাড়াতাড়ি সামলে নিতেই ভেসে উঠলো সেই বিখ্যাত আমতলা। বুকটা কেমন টনটন করে উঠলো কাউকে কি হারিয়ে ফেলার যন্ত্রণা? অথচ আমি তো আমতলায় বসতাম না কোনোদিন। কমন রুম ছিল আমার অফ পিরিয়ডের জায়গা। একটা লজ্জা, সংকোচ আমাকে আমতলায় বসতে নিষেধ করতো। কলেজের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কবিতা আবৃত্তি, আলপনা আঁকার পুরস্কার নিতে কলেজের সোস্যালের স্টেজে উঠতে পারতাম না। কমনরুম থেকে শুনতাম আমার নাম ঘোষণা চলছে। কোথাও একটা কুণ্ঠা - কিছুতেই স্টেজের দিকে পা বাড়াতে দিত না। সবে কৈশোর টপকে আসা তারুণ্যের আচমকা অভিঘাতে লাজুক মেয়েটি কমনরুমে নিজেকে লুকিয়ে রেখে স্বস্তি পেতো।

আরে ওই তো নন্দিতা, ওই তো মধুমিতা, রীতা, কাঞ্চন, মানসী, পিণাকি, তপন, ব্রততীর ঢলঢলে মুখ। দুই হাত দিয়ে, আঁচল দিয়ে কুয়াশা সরাচ্ছি, ঠিকরে বেরোচ্ছে স্মৃতির পূবালি। গ্রুপ ছবি তুলে ছিলাম একদিন। হয়তো মনের ক্যানভাসে আজীবন স্মরণীয় করে রাখার চেষ্টা। কিন্তু এতো মূল্যবান দলিল ট্রাঙ্কের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থমকে কেন? আজকাল আর ডিস্টেম্পার করা উজ্জ্বল নি-দাগ দেওয়ালে নাকি পেরেক গেঁথে ছবির সারি সাজায় না - দেশের বাড়ির মতো - আধুনিক প্রজন্মের এই নির্দেশ। অগত্যা বাক্সবন্দী স্মৃতির মিছিল। প্রাত্যহিক টানটান দৌড়ঝাঁপের দমবন্ধ ব্যস্ততায় আমার কলেজ, আমার বাংলা বিভাগ বন্দিনী হয়ে রয়ে গেছে এতকাল। ভুলতে ভুলতে ভুলেই গেছি এই অমূল্য খাজানা। আমার তরুণীবেলার সুদীর্ঘ পাঁচটা বছরের কত কথা, যেন আজ কথকতা।

বৃষ্টি থামলো বুঝি। স্মৃতির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জানালা বন্ধের কথা বেমালুম ভুলেই গেছি। জলের ঝাপটায় মেঝে, মেঝে গড়িয়ে শাড়িও ভিজে গেছে, হুঁশই হয়নি এতক্ষণ। এক নস্টালজিয়া আমাকে ছুমন্তরে নিয়ে চলে গিয়েছিল কোন সে আলো ঝলমল অতীতে। ঠাণ্ডা বাতাসে উড়ছে ভেজা পর্দাগুলো। মায়ের মমতার মতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার কপাল, চিবুক। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। খুঁজতে খুঁজতে বিহারী আমাকে চিলেকোঠার এক নির্জন কুঠুরিতে নতুন রূপে আবিষ্কার করল। আলো-আঁধারি মুখে বসে আছি আমি।

থতমত খেয়ে বললো - ম্যাডাম, কলেজের মামা এসেছিল। এই চিঠিটা দিয়ে গেল।

কলেজের চিঠি - শব্দগুলো ভীষণ মিঠে ঠেকলো আমার কানে, মনে, সত্তায়। চিঠিটা খুললাম। আগামীকাল জিবি-র মিটিং। বিশ্বনাথবাবু স্যার ফোনে বলে রেখেছিলেন। চিঠিটা তারই। যেই কলেজের ছাত্রী ছিলাম একদিন, আজ সেই কলেজেরই ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আমি। অন্য একটা ভালো লাগা কাজ করে বৈকি। আগামীকাল যখন মিটিং-এ যাবো, দেখবো সেদিনের সেই ডালপালা মেলা একটা চারাগাছ মহীরূহে

পরিণত আজ। আজ কলেজের স্বর্ণালী দিন, নবজাগরণ ঘটে গেছে যেন। পঁচাত্তর বছর উত্তীর্ণ হতে চলেছে। সাড়ম্বরে চলছে প্লাটিনাম জুবিলি উদ্‌যাপন। সুস্বাস্থ্যের জৌলুশ সব ক্ষেত্রে। ঝলমলে কলেজের বিশাল ক্যাম্পাস, ঝকঝকে রেজাল্ট ছেলে-মেয়েদের। বিবিধ বিভাগ, বিবিধ আয়োজন - যেন এক রাজসূয় যজ্ঞ চলছে। চরৈবেতি মন্ত্রে এগিয়ে চলুক আমাদের নেতাজী মহাবিদ্যালয়। ভারতের ঈশ্বর স্বরূপ দেশপ্রেমিক মহাত্মা নেতাজীর নামে নামাঙ্কিত আমাদের কলেজ, আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার - চিরকাল অহংকারীর মতোই সদর্পে, সগর্বে মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলুক বিজয় পতাকা উড়িয়ে - এই শুভ কামনা জানাই আমাদের কলেজের জন্য।

# স্মৃতির সরণিতে নেতাজী মহাবিদ্যালয়

দুলালচন্দ্র মাল

মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার সময় কতকগুলি গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই সহজাত গুণগুলি সুপ্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে। সুপ্ত গুণগুলিকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন হয় শিক্ষার। শিক্ষার মধ্যেই মানুষ পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী হয়। কিন্তু এই শিক্ষা স্থিতিধর্মী নয়, গতিধর্মী। আদিম যুগের শিক্ষার যে ধারণা মানুষের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম ছিল শিক্ষার সেই ধারণা দিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের জটিল জীবন পরিস্থিতি উদ্ভূত জটিলতার চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটান সম্ভব নয়। ভারতে ইংরেজ শাসনের সময় ইংরেজরা তাদের শাসন উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। স্বাধীনতা লাভের পর সরকার এবং কিছু দেশপ্রাণ ব্যক্তি উপলব্ধি করেন যে জনগণের স্বকীয় গুণাবলীর বিকাশ ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। এই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে ড. রাধাকৃষ্ণাণের নেতৃত্বে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন তৈরি করেন। পরে মুদালিয়ার কমিশন, কোঠারি কমিশন প্রভৃতি কমিশন তৈরি হয়েছিল।

আরামবাগ মহকুমার মানুষও শিক্ষার বিষয়ে একেবারে অসচেতন ছিল না। স্বাধীনতার পূর্বে এই মহকুমায় কতকগুলি উচ্চ বিদ্যালয় থাকলেও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। এখানে কলেজীয় উচ্চতর শিক্ষা আরম্ভ হয় ১লা আগষ্ট ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিয়ে নেতাজী মহাবিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে। এই কলেজ স্থাপন করেছিলেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল, যিনি একাধারে ডাক্তার, শিক্ষাব্রতী এবং সমাজ সেবক ছিলেন। এই কাজে যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্য। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র পাল, পঞ্চানন মণ্ডল এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রভৃতি শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ। কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় কলেজের নিজস্ব কোন জমি এবং ঘরবাড়ি ছিল না। শুধু ছিল প্রতিষ্ঠাতাদের অটুট উৎসাহ। এই উৎসাহের বশবর্তী হয়েই সত্যেন্দ্রনারায়ণ আঢ্য মহাশয় তাঁর আপন বসতবাটিতে কলেজ শুরুর উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যত্র বসবাস করেছিলেন। ফকিরচন্দ্র পাল মহাশয় নিজ গৃহে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে তিন বছরের মধ্যেই কলেজের নিজস্ব বাড়ি তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু এটিকে কলেজের বাড়ি বলে মনে হতো না। বাড়িটির চারিদিকে ছিল ইটের প্রাচীর, উপরে ছিল টিনের শেড, মেঝেতে কোন সিমেন্টের কাজ ছিল না। অর্থাৎ কলেজ বিল্ডিংটি বর্তমানে সরকারি গোডাউনের পর্যায়েও পড়ত না। এই বাড়ির মধ্যেই কলেজের যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালিত হতো। এরই মধ্যে ছিল কলেজের অফিস, ছেলেদের ক্লাস রুম, অধ্যাপকদের বসার ব্যবস্থা, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি। এমনকি কোন কোন

* প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন অধ্যাপক এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

অধ্যাপক এরই মধ্যে বসবাস করতেন। অনেক সময় ক্লাস রুমের অভাবে কলেজ প্রাঙ্গণের আমগাছের চারপাশে বেদি নির্মাণ করে শান্তিনিকেতনী আদর্শে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হতো।

শুরুতে কেবলমাত্র ইন্টারমিডিয়েট স্তরে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল। দিনের বেলায় কলা ও বিজ্ঞানের এবং সন্ধ্যায় বাণিজ্য বিভাগের ক্লাস হতো। ১৯৫৬ সালে কলেজে বি. এ শিক্ষাক্রমের প্রবর্তন হয়। পরের বছর নারী শিক্ষা বিস্তারের কথা বিবেচনা করে সহশিক্ষাও প্রবর্তিত হয়। প্রথম বছরে মাত্র দুজন ছাত্রী কলেজে ভর্তি হয়েছিল। ১৯৬০ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে। এই বছরই বি. এসসি এবং ১৯৬২ সালে বি. কম পঠন-পাঠনের অনুমতি মেলে। আবার ওই সময় থেকেই কলেজে সাম্মানিক শিক্ষারও সূচনা হয়। রজত জয়ন্তীর সময় কলেজে বাংলা সাহিত্য, অঙ্কশাস্ত্র, হিসাবরক্ষাশাস্ত্র, সংস্কৃত এবং দর্শনশাস্ত্রে অনার্স ছিল। ওই সময়ে জীবনবিজ্ঞানের বি. এসসি পড়ানোর অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কলেজে ১১টি অনার্স কোর্স, ১৫টি পাস কোর্স এবং দুটি ভোকেশনাল কোর্স পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু বর্তমানে প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর সময় অনার্স কোর্সের বিভাগের সংখ্যা ২১টি, পাস কোর্সের বিভাগের সংখ্যা ৩টি। এছাড়াও কয়েকটি ট্রেনিং কোর্সেরও ব্যবস্থা আছে।

কলেজ শুরুর সময় ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯৩ জন। রজত জয়ন্তী বছরে (১৯৭৩) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা হয়েছিল ১৫৯২ জন। ১৯৯৬ সালে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২১৯৫ জন। তার মধ্যে ছাত্র ছিল ১৪৪৯ জন এবং ছাত্রী ছিল ৭৪৬ জন। বর্তমানে প্লাটিনাম জুবিলীর সময় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫২৫৫ জন। তার মধ্যে ছাত্র ২৭৩৩ জন এবং ছাত্রী ২৫২২ জন। সূচনা পর্বে কলেজে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৯ জন। তবে অধিকাংশ শিক্ষকই ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি। অনেক সময় পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পরীক্ষা দিয়েছে এবং ফল প্রকাশ হয়নি এমন ব্যক্তিরাও শিক্ষক হিসাবে কাজ করতেন। তাছাড়া কিছু স্থানীয় চিকিৎসক ও আইনজীবী অধ্যাপনার কাজে সাহায্য করতেন। রজত জয়ন্তীর বছরে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৪৩ জন। ১৯৯৬ সালে পূর্ণসময়ের শিক্ষক ছিলেন ৫৬ জন এবং আংশিক সময়ের ১৫ জন। বর্তমানে পূর্ণসময়ের শিক্ষকের সংখ্যা ৫৪ জন্য এবং স্যাক্ট শিক্ষক ৫৬ জন।

কলেজ শুরুর সময় শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ছিল ৩ জন। সত্যেন্দ্রনাথ পাল মহাশয় ছিলেন প্রধান করণিক। অধিকাংশ কাজ তিনিই করতেন। রজত জয়ন্তীর সময় শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ছিল ১৪ জন। ১৯৯৬ সালে সরকার অনুমোদিত শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ছিল ৫০ জন এবং নিয়োগ অনুমোদিত শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ছিল ৪ জন। বর্তমানে 'সি' গ্রুপের শিক্ষাকর্মী ৪ জন, 'ডি' গ্রুপের ১৫ জন। সকলেই সরকার অনুমোদিত পদে নিযুক্ত। তবে ৩ জন আংশিক সময়ের কর্মীও আছেন।

কলেজে প্রথমে কোনো অধ্যক্ষ থাকেননি। প্রথম ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন অনিলবরণ রায়। তাঁর কার্যকাল

ছিল মাত্র দুই মাস (আগষ্ট ১৯৪৮ - সেপ্টেম্বর ১৯৪৮)। প্রথম অধ্যক্ষ হয়ে আসেন ভবানীচরণ গুহ মহাশয় (অক্টোবর ১৯৪৮ - জুলাই ১৯৪৯)। দু'বছর পরই তিনি কলেজ ছেড়ে চলে যান। এরপর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন মাননীয় গুরুদাস সেন (জুলাই ১৯৪৯ - নভেম্বর ১৯৫৬)। তিনি এক দেবতুল্য মানুষ। ওই সময় (১৯৫২-১৯৫৪) আমি কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলাম। তাঁর মধ্যে যেমন গাম্ভীর্য ছিল তেমনই ছিল কোমলতা। ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতে দ্বিধা করতেন না। তিনি আমাদের Math পড়াতেন। প্রথম বর্ষে তাঁর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে প্রথম থেকেই আমি তাঁর সংস্পর্শে আসি। তিনি একদিন আমাকে ডেকে আমার বাড়ির অবস্থা সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। যখন তিনি জানতে পারলেন যে, আমার বাড়ির অবস্থা মোটেই ভালো নয় এবং আমাকে প্রতিদিন কলেজ করার জন্য ১২/১৩ মাইল হেঁটে যাতায়াত করতে হয় তখন তিনি আমাকে আরামবাগে তাঁর নিজের রুমে থাকার কথা বলেন। একথাও জানান যে, তাঁর রুমে আমার পড়াশোনার কোনো অসুবিধা হবে না। খুব অল্প সময়ই তিনি ওই ঘর ব্যবহার করবেন। শুধু থাকা নয়, আমার খাওয়া-দাওয়ার দায়িত্বও তিনি নেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পড়াশোনা শেষে একটা চাকরি আমার খুবই জরুরী। পীযূষবাবু Math এর ছাত্র ছিলেন। Math-এ তাঁকেই নেওয়ার ইচ্ছা ছিল। তাই তিনি আমাকে সায়েন্স ছেড়ে আর্টসে ইকোনমিক্স এবং শেষ পর্যন্ত Pol. Sc. নিয়ে পড়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু ১৯৫৯ সালে যখন কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করি তখন তিনি কলেজ ছেড়ে চলে গেছেন। আর তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি।

পরবর্তী অধ্যক্ষ ছিলেন অনিলবরণ দাস (নভেম্বর ১৯৫৬ - ডিসেম্বর ১৯৫৯) মহাশয়। তিনি দক্ষতা সহকারে 'কঠোরভাবেই' কলেজ পরিচালনা করতেন। তাঁরই সময়ে কলেজ U. G. C-র অনুমোদন পায় এবং কলেজ প্রাঙ্গণের পূর্বদিকে যে বিল্ডিং আছে তার একতলা ওই অনুমোদনের সাহায্যে নির্মিত হয়। কিন্তু কলেজকে তিনি বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলেন, যা অনেকের সহ্য হল না। শুরু হল ছাত্র আন্দোলন এবং এর ফলে তিনি কলেজ ছেড়ে চলে যান কলকাতার মণীন্দ্র কলেজে। পরে বোঝা গেল এই আন্দোলনের প্রকৃত কারণ ও উদ্দেশ্য। অধ্যক্ষের অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের দ্বারা কলেজ পরিচালিত হতে লাগল। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হলেন বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক চিত্তপ্রিয় রায় (ডিসেম্বর ১৯৫৯ - অক্টোবর ১৯৬২) মহাশয়। তিনি অল্পভাষী কিন্তু পরিচালনায় দক্ষতাসম্পন্ন ছিলেন। প্রায় দু'বছর পরে (নভেম্বর ১৯৬২ - জুন ১৯৬৯) তিনি অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হলেন। তবে তাঁর কিছু শারীরিক অসুবিধা ছিল। প্রায় আট বছর পরে তাঁকে কলেজ ছেড়ে চলে যেতে হয়।

অধ্যক্ষের অবর্তমানে সহ অধ্যক্ষ হলেন অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক পীযূষকান্তি পাল (জুলাই ১৯৬৯ - ডিসেম্বর ১৯৬৯) মহাশয়। তিনি কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন। কলেজ পরিচালনার দায়িত্বভার তিনি গ্রহণ করেন।

কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রে জ্ঞানী হলেও প্রশাসনের কাজে তিনি মন দিতে পারেননি। মাস ছয়েক পরেই তিনি কলেজ প্রশাসনের দায়িত্ব ত্যাগ করেন। অতঃপর কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে ইংরেজির অধ্যাপক সত্যব্রত ভট্টাচার্য (জানুয়ারি ১৯৭০ - ডিসেম্বর ১৯৭০) মহাশয়ের উপর। ইতিমধ্যে হাইকোর্টের আদেশে কলেজ পরিচালনার জন্য আরামবাগের এস. ডি. ও. মহাশয় কলেজের প্রশাসক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তবে প্রশাসক থাকলেও কলেজ চলত শিক্ষক সমিতির পরামর্শক্রমে। শিক্ষক সমিতির বেশ কিছু প্রবীণ সদস্য সত্যব্রত ভট্টাচার্য মহাশয়ের উপর সন্তুষ্ট না থাকায় তাঁকেও পদত্যাগ করতে হয়। এই সময় সিনিয়রদের দু-একজন আমাকে কলেজের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। শেষ পর্যন্ত প্রশাসক আমাকেই কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেন। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি থেকে কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হয়। প্রথম প্রথম সিনিয়রদের পরামর্শ মতোই কাজ করতাম। কিন্তু কলেজের মধ্যে তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মত ও উদ্দেশ্য থাকায় তাঁদের পরামর্শ মতো কলেজ পরিচালনা করা সম্ভব হতো না। ফলে ক্রমশ তাঁদের সমর্থন হারাতে লাগলাম এবং শেষে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তুলে আমকে এ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অধ্যাপক ব্রজেশচন্দ্র দাস (নভেম্বর ১৯৭৪) মহাশয়কে প্রশাসক ওই পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু তিনি মাত্র আট মাস (জুন ১৯৭৫) কলেজ পরিচালনা করতে সক্ষম হন। শেষ পর্যন্ত প্রশাসক আমাকেই পুনরায় ওই পদে নিয়োগ করেন। নিরুপায় হয়ে সিনিয়ররা প্রিন্সিপাল আনার চেষ্টা করতে থাকেন। প্রায় চার বছর পর তাঁরা সফল হন। অধ্যাপক সনৎ ব্যানার্জী আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে আসেন। কিন্তু সনৎবাবু ও আমি সতীর্থ ছিলাম। উনি আমার চেয়ে তিন ক্লাস সিনিয়র ছিলেন। প্রায় সাড়ে তিন বছর (নভেম্বর ১৯৭৯ - জুন ১৯৮৩) তিনি কলেজে ছিলেন। পরে উত্তরপাড়া কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে চলে যান। আমার তো মনে হয়, উনি কলকাতার কোনো কলেজে প্রিন্সিপাল হওয়ার জন্য অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এই কলেজে এসেছিলেন। কলেজের উন্নতি সম্পর্কে তিনি খুব একটা সচেতন ছিলেন না। দৈনন্দিন কাজই চালিয়ে যেতেন।

কলেজে তখন গভর্নিং বডি হয়েছে। T.I.C. নিযুক্তির ব্যাপারে নতুন নিয়ম চালু হয়। সিনিয়রিটি বিবেচনা করে T.I.C. নিযুক্ত হতে থাকে। পীযুষবাবু সিনিয়র হলেও তিনি কলেজ পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন না। ড. কমলকৃষ্ণ সরকার (জুলাই ১৯৮৩) T.I.C নিযুক্ত হন। কিন্তু উনি পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকায় একমাস পরেই এই পদ ত্যাগ করেন। ড. রাধাগোবিন্দ কর (আগস্ট ১৯৮৩ - নভেম্বর ১৯৮৩) মহাশয় এই পদে আসেন। কলকাতা থেকে উনি যাতায়াত করতেন। অসুবিধা হতে লাগলো। তিনিও ছেড়ে দিলেন। আমার উপরের আর কোনও সিনিয়র এই দায়িত্ব নিতে রাজি না থাকায় এই দায়িত্ব আবার আমার উপরই পড়ল (ডিসেম্বর ১৯৮৩ - জুলাই ১৯৮৫)। অবশেষে এই কলেজের ছাত্র এবং আমারও ছাত্র বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ১৯৮৫ সালে কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজের উন্নতিতে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। তবে একটু জেদি মানসিকতার

ছিলেন। নিজের মতকেই বেশি প্রাধান্য দিতেন। U.G.C-র সঙ্গে যেসব সমস্যা ছিল সেগুলি অবশ্য সমাধান করে ফেলেন। কলেজ সবদিক থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। বিভিন্ন বিষয়ে অনুমোদন বাড়তে থাকে। ভোকেশনাল কোর্স খোলা হয়। NSOU এবং IGNOU-র কিছু কোর্স চালু হয়। বিল্ডিংও বাড়তে থাকে। দেখা গেল প্রায় মরা গাছে আবার পাতা গজিয়ে উঠছে। দু'একটা ফুল ফুটতেও শুরু করেছে। ২০০৩ সালে বিজয় অবসর নেওয়ার পর আসেন বর্তমান অধ্যক্ষ অসীম কুমার দে মহাশয়।

ড. অসীম কুমার দে আরামবাগের মানুষ। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল চাঁপাডাঙ্গা কলেজে যখন আমি রিটায়ারমেন্টের পরে আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসাবে সেখানে কাজ করি। তখনই আমার মনে হয়েছিল যে, Dr. De-ই আমাদের কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষ হওয়ার যোগ্য। তাঁকে আমার ইচ্ছের কথা জানাই, কিন্তু বিনয়ের সঙ্গে তিনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরে আমার আশা পূর্ণ হয়। Dr. De-ই আমাদের কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। ওনার আসার পর কলেজের প্রভুত উন্নতি সাধন হয় যা লিখে জানানোর বিষয় নয়, যা কেবলমাত্র উপভোগ করার বিষয়। উনি আসার বছর ত্রিশ আগেকার ছাত্ররা কোন কারণে কলেজে এলে কলেজ দেখে তারা অবাক হয়ে যাবে। বিভিন্ন বিষয় যেমন পড়াশোনা, ক্লাসরুম, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, ছাত্রাবাস, ছাত্রীবাস প্রভৃতি বিষয়ের প্রভুত উন্নতি সাধন হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমাদের কলেজ ফুটবলে অধিকাংশ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ছিল। আমাদের কিছু কিছু খেলোয়াড় Inter University Football Team-এ অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেত। তাদের মধ্যে গিরিজা গোস্বামী, গণেশ অধিকারী, বিশ্বজিৎ পাল, সেখ হুমায়ুন-এর নাম করতেই হয়। এই কিছুদিন আগে আমাদের কয়েকজন ফুটবল প্লেয়ার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে। বর্তমানে কলেজের শারীরশিক্ষা বিভাগ আছে। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে খেলাধুলা করার প্রবণতা বেড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃ কলেজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। সাফল্যের হার ভালোই। কোন কোন সময় আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভও করেছে।

এন.সি.সি.তে আমাদের কলেজ পিছিয়ে ছিল না। আমার সময় এন.সি.সি.তে তিনটে কোম্পানি ছিল। তিনটে কোম্পানির দায়িত্ব আমাকেই বহন করতে হতো। কারণ একজন অফিসার উচ্চ ডিগ্রি পাওয়ার জন্য পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকতেন। আর একজন আরামবাগে যে এন.সি.সি. অফিস ছিল সেখানে চার্জে থাকতেন। আমাদের এন.সি.সি.-র দু-একজন ছাত্র সময় সময় দিল্লিতে রিপাবলিক ডে প্যারেডেও চান্স পেয়েছে। এদের মধ্যে জালিম সিং-এর নাম করতেই হয়। কলেজে তখন এন.সি.সি. থেকে Firing-এর ব্যবস্থা ছিল। দুটি Firing range ও ছিল। মনে হয় এখন হয়তো সেগুলি অকেজো হয়ে পড়ে আছে।

পরিশেষে বলতে হয় যে বিংশ শতকের নবম দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কলেজের যে উন্নতি হওয়া উচিত

ছিল তা হয়নি। সেখানে ছিল গৃহ সমস্যা, লাইব্রেরি সমস্যা, ল্যাবরেটরি, ছাত্রাবাস, ছাত্রীবাস প্রভৃতির সমস্যা। কারণ ওই সময়ের বেশিরভাগ অংশেই অধ্যক্ষের পদ শূন্য ছিল। কিন্তু এখন আর বিশেষ সমস্যা নেই। প্রায় আটত্রিশ বছর হল কলেজ সরাসরি অধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। একজন অধ্যক্ষের আঠারো বছরের কর্মকাণ্ড শেষ হওয়ার পর অন্য একজন অধ্যক্ষ কুড়ি বছরেরও বেশি সময় কলেজের কর্মকাণ্ড জোর কদমে চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে কলেজের যা উন্নতি হয়েছে তা এক কথায় অভাবনীয়। Dr. De যেদিন আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সেদিন আমার যা কষ্ট হয়েছিল আজ আর তা নেই। বরং কলেজের উন্নতিতে আমার মন শতগুণ আনন্দে ভরে উঠেছে। অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের সময় কলেজের যে মৃতপ্রায় গাছে পাতা গজাতে এবং দু-একটা ফুল ফুটতে শুরু করেছিল আজ Dr. De-র সময়ে সেই গাছ পাতা, ফুল ও ফলে সুশোভিত। তবে এ কথাও বলতে ভুলবো না যে Dr. Asim Kumar De-র পাশে কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, শিক্ষাকর্মীবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ এবং সর্বোপরি উন্নতিকামী পরিচালন সমিতি থাকার ফলেই এই অভাবনীয় উন্নতি এত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়েছে। কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং প্রাক্তন অধ্যাপক ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসাবে তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই। আশা রাখি আগামীদিনে যিনি কলেজের দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন তাঁকেও একইভাবে সকলে সাহায্য করবেন এবং কলেজকে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যাবেন।

# আমার ‘আমি’তে তুমি

ড. বিমলেন্দু সামন্ত

**আমার তুমি ঃ** ‘নেতাজী মহাবিদ্যালয়’ আমার কাছে একটা আবেগ, ভালোলাগা ও ভালোবাসার নাম। আমি তখন একজন অত্যন্ত মধ্যমেধার তরুণ গবেষক ছাত্র। ১৯৭৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে এই কলেজের সাথে যুক্ত হয়ে আশা-নিরাশায়, ভাল-মন্দতে, সুদিন-দুর্দিনের সাক্ষী হয়ে কাটিয়ে দিয়েছি পুরো ছত্রিশটা বছর। মনে হয় এই সবে এলাম কলেজে। আর দেখতে দেখতেই কেটে গেল অধ্যাপনার এই কটা বছর। একেই বলে জীবন, যা নিয়ত চলমান। চলমানতা মানেই হল পরিবর্তন। অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থার আগমন। এরূপ অবস্থার আগমনের পথ ধরেই আমরা এগিয়ে চলেছি অহরহ। এর কোন বিরাম বা ছেদ নেই। আমার জীবনের চলমানতার সঙ্গে এই কলেজের চলমানতাও সমানভাবে সাযুজ্যপূর্ণ। পঁচিশ বছরের যৌবন নিয়ে এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আজ প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে কড়া নেড়ে চলেছি। অতীত স্মৃতিগুলোকে রোমন্থন করে বার্ধক্যকে উপভোগ করে চলেছি। কলেজও তার অতীতের নজর না কাড়া অবস্থা থেকে আজ এক ঈর্ষণীয় মহীরূহে পরিণত হয়েছে। এই কলেজ তাই আমার সহৃদয় বন্ধু হয়ে উঠেছে। সমবয়সী বন্ধুত্বের জোয়ারে গা ভাসিয়ে আমরা একে অপরকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমরা সমবয়সী, সমব্যথী, সমমর্মী ও অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধুতে পরিণত হয়েছি। এই কলেজ তাই আমার ভালোলাগার, ভালোবাসার ও সাধনার তীর্থক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এই কলেজই হয়ে উঠেছে আমার বার্ধক্যের বারাণসী।

**তোমার আমি ঃ** পঁচিশ বছরী এই মহাবিদ্যালয় এবং পঁচিশ বছরী এই তরুণ কলেজ শিক্ষকের জীবনে তখন অবশ্যই ছিল মলিনতা, দারিদ্র্য ও নামগোত্রহীন অখ্যাতি। দর্শনের একজন মধ্যমেধার ছাত্র হিসাবে তখন আমি ছাত্রবৃত্তি নিয়ে দর্শন গবেষণায় রত। ঐ ছাত্রবৃত্তিটুকুই তখন আমার মূল সম্বল। দিন যাপনের, কাল হরণের মূল চাবিকাঠি। সেই অর্থে দারিদ্র্য ও মালিন্য তো থাকবেই। তখনকার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কলেজে অনার্সের পাঠক্রমের চারজন অধ্যাপকের অনুমোদন ছিল। ঐ চারটি পদেই তখন চারজন গুণী অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ছিলেন। বিভাগীয় প্রধান হিসেবে ছিলেন আরামবাগের অতি প্রিয় ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অধ্যাপক সিতাংশু কুমার দত্ত মহাশয়। ছিলেন অধ্যাপিকা অনিন্দিতা চৌধুরী, ডঃ রীতা দুবে এবং অধ্যাপক অসীম কুমার পাঠক। অধ্যাপক অসীম কুমার পাঠক মহাশয় সরকারি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত হওয়ায় তখন তাঁর পদটি শূন্য হয়। যাবতীয় সরকারি নিয়ম কানুনের মধ্যে দিয়ে আমি ঐ শূন্যপদে নিয়োগ পাই। ইচ্ছা

* প্রাক্তন অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

ছিল গবেষণা শেষ করে চাকরি করা, আর সারাজীবনের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা করা। কিন্তু হঠাৎই সুযোগ পাওয়ায় আর চাকরির অপ্রতুলতার কথা চিন্তা করে, শুভানুধ্যায়ীদের পরামর্শে ঐ পদে যোগদান করতে আমি আর দ্বিতীয়বার চিন্তা করি নাই। তখনও আমার মধ্যে মলিনতার সেই গন্ধ থেকেই গেছে। নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের মধ্যেও তখন মলিনতার ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট।

**বাহ্যরূপে তুমি ঃ** কলেজ বলতে তখন ছিল একটি পাকা দ্বিতল অফিস বিল্ডিং, ইউজিসি-র অনুদানে একটি পাকা একতলা বিল্ডিং - যা আর্টসের বিভিন্ন বিভাগের শ্রেণীকক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হতো। টিনের ছাউনি দেওয়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগগুলো, আর খড়ের চালার ছাউনি দেওয়া বেশ কিছু শ্রেণীকক্ষ। এই শ্রেণীকক্ষগুলির সামনে ছিল কয়েকটি সপ্তপর্ণী ছাতিম গাছ আর খেলার বিস্তীর্ণ মাঠ। নেহাতই সাদামাটা এই কলেজ। তখন এই কলেজের না ছিল কোন বাহ্যিক চাকচিক্য। একই শ্রেণী চরিত্রের অধিকারী হওয়ায় এই মহাবিদ্যালয় তাই আমার অভিন্ন হৃদয়ের, অকৃত্রিম ভালোবাসার এক সহমর্মী বন্ধু হয়ে উঠেছিল। তখনকার দিনে কলেজের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম, একেবারে হাতে গোনা। প্রথমদিকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন হলেও পরবর্তীতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এই কলেজ পরে পরে চূড়ান্ত পরীক্ষাগুলোতে আকর্ষণীয়ভাবে ভাল ফল দেখিয়েছে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নিজস্ব এক স্থান করে নিয়েছে এবং বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় নিজের নাম উজ্জ্বল করেছে। স্নাতকোত্তর স্তরের বেশিরভাগ সিটই এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা দখল করে চলেছে। কলেজের অভ্যন্তরীন উন্নতির সাথে সাথে দিনে দিনে বাহ্যিক রূপও বেড়েই চলেছে। এভাবেই কলেজ তার মলিনরূপ ঝেড়ে ফেলে সুন্দরী কমলার রূপ পরিগ্রহ করেছে। আজ পঁচাত্তর বছরে কলেজ এক নিখুঁত সৌন্দর্যে ভরা মোনালিসা হয়ে উঠেছে। তার হাতছানিতে আমরা আজ সকলেই মত্ত হয়ে পড়েছি।

**আন্তর রূপে তুমি ঃ** বাহ্যিক মলিনতা থাকলেও এই মহাবিদ্যালয়ের অন্তরে ছিল এক অমূল্য সম্পদ, যা তার অন্তর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়েছে। এরূপ উপলব্ধিতেই বলতে ইচ্ছে করে - "অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে"। এই আলোকিত সম্পদ হল - ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে এক নিবিড় ভালবাসা, সহকর্মীদের মধ্যে এক সুন্দর প্রেমময় মেলবন্ধন, পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন, সহমর্মী রূপে সহকর্মী হয়ে ওঠা এবং আপদে-বিপদে আপনজন হয়ে ওঠা। মতান্তর হলেও মনান্তর হয়নি কখনও। স্বাধীন মত প্রকাশে, গঠনমূলক আলোচনায় ও সমালোচনায় কখনোই মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়নি। বরং বলা যায় যে, সহৃদয় আন্তরিকতা ও পারস্পরিক ভালবাসায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে আমাদের এই মহাবিদ্যালয়। আমরা আমাদের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়েই 'নেতাজী' নামের এই মহাবিদ্যালয়ের প্রতি সুবিচার করতে সমর্থ হয়েছি। আমরা ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা সকলে মিলে

একসাথে ঐকতান রচনায় সমর্থ হয়েছি। এই মহাবিদ্যালয় তাই হয়ে উঠেছিল এক বৃহৎ সুখী যৌথ পরিবার, এক শান্তির নিকেতন। রাবীন্দ্রিক ভাবধারার এক নূতন শান্তিনিকেতন। সপ্তপর্ণী ছাতিমের পাতার দোলায়, খড়ের ছাউনিতে আশ্রমিক শ্রেণীকক্ষের অবস্থানে, গাছের ছায়ার নীচে উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে অস্থায়ী পঠন-পাঠনের পরিবেশে এবং সকলের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ হয়েছে এই মহাবিদ্যালয়। রাঙা পলাশের শোভায় সজ্জিত হয়ে উঠত ঠিক যেন এক নয়া শান্তিনিকেতনের রূপে। আনন্দের আনন্দধারায় প্লাবিত হয়ে আমরা সকলেই যেন এক সুখী গৃহকোণে অবস্থান করেছি। আনন্দ ছিল ছাত্রদের মধ্যে, আনন্দ ছিল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে, আনন্দ ছিল সবার। এ যেন সার্বিক আনন্দের এক পবিত্র ধারা। এই আনন্দ আশ্রম থেকেই আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা দিকে দিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আনন্দের এই বারিধারা তাই বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গেছে। এখানে তাই আমার 'আমি'কে খুঁজে পেয়েছি। এই আমার 'আমি'কে খুঁজে পাওয়াই হল উপনিষদের মূল কথা। আমাদের অনুভূতি তাই আমাদেরকে টেনে নিয়ে গেছে 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি'র উপলব্ধিতে। এরূপ অনুভূতিতেই মানুষ হিসেবে আমরা মহেশ্বরের অনুভূতি লাভে ধন্য হয়েছি। মহাবিদ্যালয়ের এই মৃণ্ময় ক্ষেত্রই তাই আমাদের জীবনে চরম সার্থকতা এনে দিয়েছে।

**আধুনিক কমলা রূপে তুমি ঃ** আধ্যাত্মিকতার বুনিয়াদে ঋদ্ধ এই মহাবিদ্যালয় বর্তমানকালে আধুনিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে তার বিশাল গর্বোদীপ্ত আকৃতিকে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে। আধুনিকতার স্পষ্ট ছাপে আজ তা সকলের নজরবন্দী হয়েছে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় তা আজ এক মহীরূপে পরিণত হয়েছে। সুন্দরী কমলার নাচে সে যেন এক নৃত্যরতা সুন্দরীতে পরিণত হয়েছে। সকলের নজর তাই তার দিকে। এ যেন এক মিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ পরিগ্রহ করেছে। স্নাতক স্তরের আধুনিক নানা বিষয়ের উপর সাম্মানিক পাঠক্রম চালু হয়েছে। সমস্ত বিষয়ের নিজস্ব বিভাগ ও বিভাগীয় গ্রন্থাগার চালু হয়েছে। বহু গ্রন্থ সমন্বিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার স্নাতকোত্তর পাঠক্রমও চালু হয়েছে বাংলা বিভাগে। এখানে যেন উপনিষদীয় আশ্রমিক কাঠামোর সঙ্গে আধুনিক উন্নত অ্যান্টিলিয়ার এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তা দেখে আমরা এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করছি, গর্ববোধ করছি, আর মনে মনে অতীত রোমন্থনের মাধ্যমে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হচ্ছি। আমরা তাই অতীত মলিনতার দুঃখ হরণের উপায় খুঁজে পেয়েছি এখানে। খুশিতে আবেগ মথিত হয়ে তাই বলতে ইচ্ছে করে - "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে ..."। কল্পনার আরব সাগর যেন এক আনন্দ সাগরে পরিণত হয়েছে। এ যেন নৃত্যশৈলীতে পরিপুষ্ট সুন্দরী কমলার নৃতরতা এক অপূর্ব রূপ - যা আমার অন্তরে নৃত্য করে চলেছে অহরহ। পরিবর্তনের সৌন্দর্যে এই মহাবিদ্যালয় তাই আজ সকলের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

**দার্শনিক উপলব্ধিতে তুমি ঃ** গ্রিক দার্শনিক হেরাক্লিটাসের ''একই নদীর জলে কখনও দুবার ডুব দেওয়া যায় না''- এরূপ সত্যের উপর ভিত্তি করেই জাগতিক জগতের সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন ঘটে চলেছে। উপনিষদীয় আন্তর অনুভূতি থেকে শুরু করে আধুনিক গর্বদীপ্ত অনুভূতি - সবই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন এসেছে আমার কর্মজীবনেও। পরিবর্তনের রীতিতেই আমার কর্মজীবনে হয়েছে ছন্দপতন। ২০১০ সালের মার্চ মাসে হল প্রত্যক্ষভাবে আনন্দ অনুভূতির অবসান। নিয়মের বেড়াজালে অবসরের হাত ধরে ফিরে এলাম নিজের কুটিরে। এখানে নেই কোন বাহ্যিক আড়ম্বর, প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কোন প্রচেষ্টা, স্বার্থ সমন্বিত কোন প্রতিযোগিতা, আর স্নায়বিক কোন দ্বন্দ্ব। এখানে আছে শুধু অতীত রোমন্থনের এক অনাবিল আনন্দ, আর সবকিছুকেই আবার নূতন করে পাওয়ার আনন্দ। এই আনন্দই আমি উপভোগ করে চলেছি অহরহ। নিত্য নূতন দিনের আনন্দের নূতন নূতন পশরা আমাকে মুগ্ধ ও ঋদ্ধ করে চলেছে। এভাবেই দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছি চরম আনন্দের দিকে। ক্ষয়িষ্ণু দেহের সমস্ত কিছুকেই ক্ষয় করে, নূতন জীবনের আশায় মনকে শান্ত করেছি। ক্রমান্বয়ে ভেবেই চলেছি কখন আসবে সেই চরম সময় যখন আমি হাসি মুখে বলতে পারব ''মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান''। মানব জীবনে মৃত্যু অব্যয়। জীবনের যন্ত্রণা নিয়েও মরার যে আনন্দ সেতো এক অনন্য অনুভূতি। খুব কম মানুষের ভাগ্যেই তা মূর্ত হয়। অব্যক্ত ও অনন্য আনন্দধারায় তা প্লাবিত হয়ে, মানুষ নিজেকে স্বর্গের দূত হিসাবে যমের দুয়ারে হাজির করে। মানুষ তাই মরেও অমর হয়। এভাবেই মানুষ অমরত্বের স্বাদ গ্রহণ করে। তোমার বিচ্ছেদেও তাই ছেদহীন আমি।

**চিরন্তন সত্যে তুমি ঃ** সবশেষে বলি চিরন্তন সত্যে তোমার অবস্থানের কথা। আমরা না থাকলেও তুমি থাকবে চিরন্তন সত্যের ধ্বজা ধরে। তোমার আঙিনায় সপ্তপর্ণীর পাতায় নূতন নূতন পাতা গজাবে, রাঙা পলাশের ফুলে নূতন নূতন রং ধরবে। নূতন নূতন দৃশ্যপটে তুমি মোহময়ী হয়ে উঠবে। নূতন নূতন ছাত্র-ছাত্রীর আগমন ঘটবে তোমার আঙিনায়। বিভিন্ন বিভাগে তারা অধ্যয়নে রত হবে। নবীন-প্রবীণ অধ্যাপকেরা তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। বিভিন্ন ভাবে তারা নিজেদেরকে, তোমাকে এবং দেশকে সমৃদ্ধ করে তুলবে। তারা বলতে সমর্থ হবে 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'। আর এভাবেই তারা উন্নতির চরমতম শিখরে আরোহণ করবে। এভাবে এগিয়ে যাওয়াই হল সত্য, যাকে বলা হয় 'ভবন'। ভবনের মধ্যে দিয়েই হয় ভবিষ্যতের আগমন। ভবিষ্যতের আগমন ছাড়া জীবন কখনোই পূর্ণতা পেতে পারে না। এভাবেই এগিয়ে যেতে যেতে তারাও একদিন শান্ত চিত্তের অধিকারী হবে। পাওয়া-না পাওয়ার দোদুল্যমান অবস্থায় তারা নিজেকে শান্ত করে নেবে। বেদান্ত বাঁশির মূল সুরের দিকে আবিষ্ট শিশুর ন্যায় তারাও এক পা এক পা করে এগিয়ে যাবে। এ ভাবেই 'আমিত্ব'-র বলিদানে 'ব্রহ্মত্ব'-র উপলব্ধি ঘটবে। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে তারাও মরণকে বন্ধুর ন্যায়

আলিঙ্গন করবে। মৃত্যুভয় তাদের কাছে তাই কোন দুঃখ বা ভয়ের অনুভূতি হবে না। তাদের কাছে মৃত্যু হবে এক পরমানন্দের অনুভূতি। এরূপ সত্যই যখন তারা অনুভব করতে সমর্থ হবে, তখনই জীবন ও জগতের 'চলমানতা' পূর্ণতা পাবে। বর্তমানের বুকে বসে আমি বর্তমান সত্যেরই উপলব্ধি করেছি। মেতে আছি জানার আনন্দে। আনন্দের উৎসগুলির সন্ধান করে চলেছি অহরহ। ভবিষ্যতের উপলব্ধি ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক, শুধুমাত্র তার উপলব্ধিগত কাল্পনিক অনুভূতি ছাড়া। এভাবেই আমি আর তুমি হাতে হাত রেখে একই সাথে ভবনের পথ ধরে এগিয়ে যাবো চিরন্তন সত্যের পথে। এটাই হল আমার হৃদয় নিঃসৃত আন্তরিক উপলব্ধি - যা ধরা পড়েছে আমার 'আমি'তে।

# আমার স্মৃতিতে নেতাজী মহাবিদ্যালয়

**মণিমোহন নন্দী**

স্মৃতির পটে জীবনের  ছবি এঁকে মনের দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছিলাম বহু কাল ধরে। আজ সেটাকে ঝেড়ে-পুঁছে আর একবার  দেখার ইচ্ছেটাকে ধরে রাখতে পারলাম না। আজ 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়' গুটি গুটি পায়ে ৭৫ বছর পার করলো। এই দীর্ঘ পথের যাত্রী হয়তো আমরা অনেকেই। কিন্তু হাঁটি-হাঁটি, পা-পা শেখানোর মানুষ ছিলেন কয়েকজন গোনাগুন্তি মানুষই। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয়। তাঁর অসীম ধৈর্য্য, আত্মবিশ্বাস, নিরলস প্রচেষ্টাকে সম্মান জানিয়েছিলেন সেই সময়কার সর্বস্তরের মানুষ। বল্লভ, কুণ্ডু, নন্দী ও বিশেষভাবে আঢ্য পরিবার সর্বান্তকরণে  সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন। আর সকলে মিলে মহাপুরুষের নামে 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

সে যেন কত যুগ আগের কথা। সময়টা ছিল ১৯৬৯-৭২ সাল। হাফপ্যান্ট ছেড়ে সবে দড়ি দেওয়া ফুলপ্যান্ট পরে কলেজের গণ্ডিতে পা দিলাম - হ্যাঁ গণ্ডিই বলব, কারণ না ছিল কোনো বড়োসড়ো গেট, না ছিল দারোয়ান, না ছিল বড়ো মঞ্জিল, না ছিল কোনো বাহারী চাকচিক্য। শুধু ছিল বাঁকা দ্বারকেশ্বর নদের শীতল বাতাস, ফুলের সুবাস, সবুজের সমারোহ, আর পাখির কুজন। সেই প্রকৃতির মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। অনুভবের তাড়নায় জ্ঞানের ভুবন দেখার প্রবল ইচ্ছে মনে বাসা বাঁধলো। সেই সময়ে সেই বাসাকে মজবুত করেছিলেন মাত্র ২০-২৫ জন শিক্ষক। জ্ঞানের মধ্যে আনন্দ জোগানোর চাবিকাঠি যেন তাঁদেরই হাতে লুকানো। সময়ের প্রবাহে যেন অংশীদারিত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল তাঁদের সাথে। সেই সম্পর্ক যেমন সাবলীল, স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনই মধুর আবার গাম্ভীর্যপূর্ণ অভিভাবকত্বেও ভরপুর। তাঁদের কাছ থেকে যেমন পিতা-মাতার স্নেহ-ভালোবাসা পেয়েছি, তেমনি সময়ানুযায়ী সঠিক পরামর্শ বা কঠোর শাসনও পেয়েছি। তাই তো তাঁদের কথা মনে পড়লে আজও শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। রবিঠাকুরের বাণী যেন তাঁদেরই জন্য লেখা - ''আমাদের শিক্ষার মধ্যে এমন একটি সম্পদ থাকা চাই, যা কেবল আমাদের তথ্য দেয় না, সত্য দেয়। যা কেবল ইন্ধন দেয় না, অগ্নি দেয়।" সেই সত্য আর অগ্নিকে পাথেয় করে ধীরে ধীরে নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে শুরু করলাম। তাঁদেরই অনুপ্রেরণায় মহাবিদ্যালয় পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে হাঁটা শুরু করলাম। কখন যে নিজের শাসন ক্ষমতা নিজেরই হাতে নিলাম বুঝলাম না।

আমার কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্রটা যেন পুরোটাই আলাদা। কারুকার্যযুক্ত প্রবেশদ্বার, বিশাল শ্রেণীকক্ষ, সুসজ্জিত রাস্তা আর বিপুলাকার পরিকাঠামো। কিন্তু আমার মন জুড়ে ছিল মহাবিদ্যালয়ের সেই ছোট্ট শ্রেণীকক্ষ

* প্রাক্তন ছাত্র ও প্রাক্তন অধ্যাপক

যেখানে ৪০ জনের বেশি বসতে পারতো না, বড়োজোড় ঘেঁসাঘেঁসি করে ৪৫ জন। সেই বয়সে ৪৫ জনের বসার মধ্যেই বেশি আনন্দ ছিল। মনে মনে ভাবি, ''আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম''। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, একজোট হয়ে লাইব্রেরিতে পড়াশোনা - ''স্মৃতিগুলো কিছুতেই পিছু হটে না''।

শুনেছিলাম মানুষ যা মন থেকে চায় তাই পায়। আমার ক্ষেত্রেও তাই হলো। ১৯৭৭ সালে আমাকে বাণিজ্য বিভাগে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করা হলো আমারই চির আকাঙ্ক্ষিত নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে। সেদিনের কথা মনে পড়লে আজও আমার মনে শিহরণ জাগে। কলেজের প্রথম দিন - আমার শিক্ষকদের সাথে একই শিক্ষকরুম (Staff room) এ বসার সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। অকারণে বাইরে পায়চারি, মনে এক অজানা অস্থিরতা। যে শ্রেণীকক্ষে একদিন ছাত্র ছিলাম সেখানে শিক্ষকের চেয়ারে বসার রোমাঞ্চকর অনুভূতি। বাবা-মায়ের আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে শিক্ষকমহাশয়দের প্রণাম করে শ্রেণীকক্ষে গেলাম। ঢুকেই একেবারে 'থ'। দেখে মনে মনে ভাবলাম আমার থেকে বড়ো আমার ছাত্র-ছাত্রীরা। মনকে শান্ত করে শিক্ষকদের দেওয়া উপদেশের বুলি আওড়ালাম। কয়েকদিনের মধ্যেই বোধকরি তাদের মনে জায়গা করে নিয়েছিলাম। সেই সুবাদেই ১৯৮০ সালে স্থায়ী অধ্যাপকের পদে আসীন হলাম।

ধীরে ধীরে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে পড়লাম। কোনো গরীব, মেধাবী ছাত্র দেখলে মনের মধ্যে জেদ চেপে বসত আর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে কুণ্ঠা হতো না। সংসার, পারিবারিক ব্যবসা প্রভৃতি চাপের মাঝে সময় বের করতে ভীষণ কষ্ট হতো। কিন্তু তখন মায়ের কথা মনে পড়তো - ''সময়কে বশে আনতে পারলেই সময় তোমার দিকে ছুটে আসবে''। সত্যি এই দীর্ঘ কর্মজীবনে কোনোসময় দুঃস্থ, গরীব, মেধাবী ছাত্রের জন্য সময় বা অর্থ কোনো কিছুরই ঘাটতি পড়েনি। বলতে গর্ববোধ করি তাদের মধ্যে বেশিরভাগ ছাত্রই আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ইচ্ছাশক্তি আর অদম্য সাহসকেই জীবনের পাথেয় করে এগিয়ে ছিলাম। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় ছিল - কর্মজীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে ২০১০ এ দাঁড়িয়ে যখন পিছন ফিরে চাওয়া-পাওয়ার হিসাব কষলাম তখন দেখলাম সেই গণ্ডিটানা কলেজের সীমাহীন বিস্তার। প্রশস্ত শ্রেণীকক্ষ, উন্নত প্রেক্ষাগৃহ (Auditorium) প্রত্যেক বিভাগের আলাদা আলাদা কক্ষ, সর্বত্র ইন্টারনেটের সুবিধা, প্রতিটি বিভাগের সাথে অধ্যক্ষ মহাশয়ের Tele Communication এর ব্যবস্থা। সর্বোপরি স্বর্ণাক্ষরে লেখা 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়'-এর উঁচু করা তোরণদ্বার (Gate)। আজ 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়' বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম সারিতে জায়গা করে নিতে সফল হয়েছে। তাছাড়াও Netaji Subhas Open University এবং Indira Gandhi National Open University নামে দুটি দূরশিক্ষা কেন্দ্রের স্টাডি সেন্টার এই মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে অবস্থিত।

আজও কলেজের দ্বারে গিয়ে মাঝে মাঝে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করি। সেখানে কত চঞ্চলতা, কত

ব্যস্ততা, কত উন্মাদনা, কত অদ্ভুত 'নতুন যৌবনের দূত'। সেখানে যেন থেমে থাকা মানা। হঠাৎই ভিড়ের মাঝে পায়ে শক্ত মজবুত হাতের স্পর্শ পেলাম। মুখ তুলে দেখি - কিন্তু ছানিকাটা চোখে ঠিকমতো ঠাওর করতে পারি না। বলে 'স্যার চিনতে পারছেন? আপনার ছাত্র'। ধাঁধাঁতে থাকি। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনেক মেধাবী সরলমুখ। মনে মনে উপলব্ধি করি - সেই tradition সমানে চলছে। দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করি। মনে মনে কবি কালিদাস রায়ের কবিতা আওড়াই -

"রাজপথে দেখা হলে কেউ যদি গুরু বলে
হাত তুলে করে নমস্কার
বলি তারে হাসিমুখে - বেঁচে বর্তে থাকো সুখে
স্পর্শ করি কেশগুলি তার।"

আজ কলেজের অমৃত মহোৎসবের ৭৫ তম পূর্তি দিনের সাক্ষী হতে পেরে আমি উৎফুল্ল, গর্বিত এবং আনন্দিত। সময়ের ছন্দে রচিত হোক নতুন উপন্যাস, নতুন প্রজন্মের হাত ধরে এগিয়ে যাক অসীম দূর সীমান্তে, অনন্ত জ্ঞানের সন্ধানে।

আমার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী মহাপুরুষের আদর্শের আলোয় প্রজ্জ্বলিত করুক ৭৫ তম বর্ষপূর্তির প্রদীপ। সেই প্রদীপের শিখায় আলোকিত হোক মহাবিদ্যালয়ের সফলতা। জীবনের খাতায় সকলে গর্বের সঙ্গে লিখে রেখে যাক "আমার স্মৃতিতে নেতাজী মহাবিদ্যালয়"।

# আমার কলেজ, আমার জীবন

ড. প্রণব কুমার দালাল

নেতাজী মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ - আমার কলেজ, আমার গর্ব, আমার অহংকার। ১৯৮০ সালের ৫ই ডিসেম্বর আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছি একটা কাজে। হঠাৎ আমার মাস্টারমশাই তুল্য সম্প্রতি প্রয়াত সুধীর রায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা। আমাদের মধ্যে কুশল বিনিময় হল। আমি একটা প্রণাম করে বললাম, স্যার আমি কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে চিঠি পেয়েছি নেতাজী মহাবিদ্যালয়, আরামবাগে জয়েন করার জন্য। উনি তৎক্ষণাৎ বললেন, খুব ভালো সংবাদ, তুমি ইমিডিয়েটলি ওখানে জয়েন করো। খুব ভালো কলেজ, এতদঞ্চলে সবচেয়ে বড় কলেজ। ভালো ভালো ছাত্র-ছাত্রী পাবে, ভালো সহকর্মী পাবে, ভালো পরিবেশ পাবে।

আমি এই কলেজে জয়েন করলাম ২৩ ডিসেম্বর, ১৯৮০ তে। অল্পদিনের মধ্যেই বুঝলাম আমার স্যারের কথাগুলির মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জন ছিল না। ভালো কলেজ পেলাম শুধু নয়, ভালো ভালো নাম করা এক ঝাঁক শিক্ষকও পেলাম - অম্বুজ বসু, মুরারী মান্না, পীযূষ পাল, রথীন হাজরা, দুলালচন্দ্র মাল, শক্তি মান্না, দেবু সামন্ত, শশধর কোলে, আদিত্য রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, প্রণব দত্ত, ব্রজেশচন্দ্র দাস, সত্যব্রত ভট্টাচার্য; পরের দিকে পেলাম উদয় নন্দী, সুব্রত চট্টোপাধ্যায়, পরমার্থ ঘোষ, গোপাল চন্দ্র সিনহা প্রমুখ। যাঁদের নাম করলাম না, তাঁরাও কোনও অংশে কম ছিলেন না। যা কিছু করতাম একজোট হয়ে করতাম, তা সে কলেজের কোনো উৎসবই হোক, কোনও অনুষ্ঠানই হোক বা বাৎসরিক পিকনিক হোক। মনে আছে ১৯৮৮ - ১৯৮৯ সালে ইউ.জি.সি. বিল্ডিং-এর দোতলাটা হচ্ছে। সেদিনটায় নতুন বিল্ডিং-এর ঢালাই ছিল। প্রিন্সিপাল বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ আমরা যারা আরামবাগে থাকি, তাদেরকে বললেন একটু থেকে যেতে। আমরা যে যার বাড়িতে খবর দিয়ে দিলাম যে ফিরতে রাত হবে। ঢালাই-এর কাজ শুরু হল বেলা দুটো নাগাদ। কাজ চলছে তো চলছেই। সন্ধে গড়িয়ে রাত হয়ে গেলো। তখনও দেখি অর্ধেকটার মতো কাজ এগিয়েছে। অম্বুজবাবু আর সত্যবাবুকে পাঠালাম প্রিন্সিপালের কাছে এই বলতে যে, বাকি কাজটা পরের দিন হোক। প্রিন্সিপাল অনড়। উনি বললেন, দেখুন না ঠিক হয়ে যাবে। এই করে রাত গড়িয়ে সকাল হয়ে গেলো। কাজ শেষ পরেরদিন সকাল ৮টা। সেদিন ননটিচিং-এর কয়েকজনও যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। আমাদের যৌথ প্রয়াসে কাজটি সমাপ্ত হল। এটা তো একটা উদাহরণ মাত্র। কলেজের বড় বড় দায়িত্ব আমরা এভাবেই সামলেছি। হিস্ট্রি কনফারেন্স হয়েছে আমাদের কলেজে, প্রিন্সিপালদের সম্মেলন হয়েছে আমাদের কলেজে। আমরা সব কাজই যৌথ উদ্যোগে বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছি।

* প্রাক্তন অধ্যাপক

আমি যখন কলেজে এসেছি তখন কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষের পদে কেউ ছিলেন না। ওই চেয়ারের কাজ চালাতেন কোনো না কোনো প্রফেসর। অনেকটা মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো - কখনো ব্রজেশচন্দ্র দাশ, কখনো কমল সরকার, কখনো রাধাগোবিন্দ কর এবং বেশিরভাগটাই দুলালচন্দ্র মাল। ফলে কলেজ পরিচালনা এবং পড়াশোনার পরিবেশে কিছুটা ঘাটতি লক্ষ্য করতাম। কিছু ফাঁকিবাজ শিক্ষক অধ্যক্ষ না থাকার সুযোগ নিতেন। যাই হোক ১৯৮৫ সালে বিজয় কৃষ্ণ ঘোষ এই কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ রূপে যোগদান করলেন। উনি আসার পর থেকে কলেজের পরিবেশটা একটু একটু করে বদলাতে শুরু করল। পঠন-পাঠনের উন্নতি ঘটলো, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হল, কলেজ পরিচালনাতেও একটা পরিবর্তন এলো। কখনো কখনো যে সমস্যা তৈরি হত না তা নয়, তবে সেগুলি খুব বড় আকার নিত না, মিটে যেত।

বিজয়বাবু আসার পর থেকে একটি প্রথা চালু হয়েছিল। প্রতি বছর শীতকালে কলেজের শিক্ষকরা সপরিবারে একটি পিকনিকের আয়োজন করতাম। কোথায় না গেছি আমরা - কখনও মুকুটমণিপুর, কখনও দীঘা, কখনও বিষ্ণুপুর, কখনও মাইথন, কখনও গুসকরার কাছে একটি ফরেস্টে কখনও গড়মান্দারণে। এই পিকনিককে কেন্দ্র করে কী উত্তেজনা। আমরা তখন তরুণ তুর্কী। আমি, দেবুদা, মইনুদ্দিন, শক্তি মান্না, পরমার্থ, তরুণ ঘটক, মুরারী মান্না। এটা একটা বাৎসরিক অনুষ্ঠানের মতো ছিল। আমরা একসঙ্গে আনন্দে মেতে উঠতাম, আবার কোনও সমস্যা এলে একসাথে তার মোকাবিলা করতাম। একবার দীঘা গেছি, আমাদের রান্নার টিমটা তেমন পটু ছিল না। ফলে দিনের প্রধান খাবারটাই আমাদের মনের মতো হয়নি। তাতে কী হয়েছে? ফেরার সময় ওল্ড দীঘায় কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। নব, মইন, শক্তিদা, পরমার্থ এবং আরও অনেকে কিছুক্ষণের মধ্যে লুচি, আলুর দম বানিয়ে হাতে হাতে ধরিয়ে দিল। পেট ভরে খেলাম।

এইভাবে বিজয়বাবু আসার পর প্রথম আট-দশ বছর বেশ আনন্দের মধ্যেই কেটেছিল। কলেজের স্টাফরুমে একটা ক্যারমবোর্ড আনা হল। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে আমরা ক্যারমও খেলেছি। এমনকি ক্লাস শেষ হয়ে যাবার পরেও ঘন্টার পর ঘন্টা আমরা ক্যারম খেলেছি। নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হতই, এমনকি বাইরের কলেজের সঙ্গেও আমরা প্রতিযোগিতায় সামিল হয়েছি। পাশাপাশি কলেজের মধ্যে চাঁপাডাঙ্গা কলেজটা ছিল ক্যারম খেলার জন্য এগিয়ে। প্রথমে ওদের কলেজ আমাদের কলেজে এল, আমরা হেরে গেলাম। আসলে সেদিন আমাদের কলেজে অন্য একটা প্রোগ্রাম ছিল, ফলে মনটা ওইদিকেই ছিল। পরে একদিন ওদের কলেজে গেলাম। ওরা তো দামি দামি পুরস্কার কিনেছে, কারণ ওরা জানে ওরা জিতবেই। আমাদের দুটো টিম, ওদের দুটো টিম। প্রথম টিমটায় আমি আর মইন, দ্বিতীয় টিমে দেবুদা আর পরমার্থ। প্রথম গেমটা আমরা নীল গেম দিলাম। দ্বিতীয় গেমটা মইনুদ্দিন হিট করে সমস্ত ঘুটি ফেলে দিল। জাজ তখনই খেলা শেষ করে আমাদের বিজয়ী ঘোষণা করলেন। আর দ্বিতীয় টিমটাও বেশ কৃতিত্বের সাথে জিতে গেল। আনন্দ

করতে করতে বাড়ি ফিরলাম।

কিন্তু আর বেশিদিন এই সুখ স্থায়ী হল না। ক্রমশ প্রিন্সিপালের সঙ্গে টিচারদের বিভিন্ন ব্যাপারে মনোমালিন্য দেখা দিল। প্রিন্সিপাল একদিকে (গুটি কয়েক টিচার ছাড়া) বাকি টিচার অন্যদিকে। এমনকি দুলালবাবু, সত্যবাবু, ব্রজেশবাবু, কমলবাবু, দীপকবাবু পর্যন্ত প্রিন্সিপালের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, যদিও তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিজয়বাবুর শিক্ষক। অবশ্য বিজয়বাবু কখনো কোনো মাস্টারমশাই বা শিক্ষককে অশ্রদ্ধা করেননি। তাঁর সঙ্গে শিক্ষকদের ছিল নীতিগত বিরোধ। এই বিরোধ শেষ পর্যন্ত এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে, বিজয়বাবু তাঁর প্রিয় স্টাফরুমে বসাই বন্ধ করে দিলেন। বাকি যতদিন তিনি কলেজে ছিলেন, তত দিনই এই সম্পর্ক বজায় ছিল। এমনকি যেদিন ওঁনার কলেজে শেষদিন, সেদিনও গুটি কয়েক শিক্ষক ছাড়া বাকি সমস্ত শিক্ষক বিদায় সংবর্ধনাতে অনুপস্থিত থাকলেন।

এক দরজা দিয়ে বিজয়বাবু গেলেন অন্য দরজা দিয়ে ঢুকলেন ড. অসীম কুমার দে। তাঁর কার্যভার গ্রহণের সব ব্যবস্থাই আগে থেকে ঠিক হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলে রাখি বিজয়বাবুর সঙ্গে শিক্ষকদের সম্পর্ক যাই হোক না কেন, কলেজটার তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং কলেজ উত্তরোত্তর ভালোর দিকেই এগোচ্ছিল। আরামবাগ কলেজের টিচিং এবং নন-টিচিং উভয় পক্ষই নিজ নিজ করণীয় কর্তব্য বিষয়ে সজাগ ছিলেন। শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নিতেন। রেমোডিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা চালু করেছিলেন আগের প্রিন্সিপাল। নির্দিষ্ট সিলেবাসের পড়া শেষ হলে রেমেডিয়াল ক্লাস শুরু হতো, অনেকটা টিউটোরিয়াল ক্লাসের মতো। আমাদের শিক্ষকরা যত্ন নিয়ে এই কাজটা করতেন। ননটিচিংরাও নিজেদের কাজ আপ-টু-ডেট করে রাখতেন। কোনো তরফেই কোনো গাফিলতি ছিল না। ফলে কলেজটিকে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন বিজয়বাবু। আর এই শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে অসীমবাবু তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে হাল ধরলেন।

ক্রমে কলেজটা আরো উন্নতির দিকে এগোতে থাকল। নতুন নতুন বিল্ডিং হতে লাগলো। গোটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেকশনটাই মূল কলেজ ভবন থেকে আলাদা করে দেওয়া হলো কাজের সুবিধার জন্য। নতুন নতুন ফ্যাকাল্টি গড়ে উঠলো। প্রত্যেক ফ্যাকাল্টির জন্য আলাদা আলাদা রুম ও লাইব্রেরির ব্যবস্থা হল। স্টাফ রুমটা অধ্যক্ষের চেম্বারের পাশেই নিয়ে যাওয়া হল। তবে অধিকাংশ টিচাররাই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন নিজের নিজের ফ্যাকাল্টি নিয়ে। বাংলায় এম.এ চালু হয়ে গেল। প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের রেজাল্ট ক্রমশ ক্রমশ ভালোর দিকে যেতে থাকলো। শুধু পড়াশোনা নয়, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিভাগেও কলেজের যথেষ্ট উন্নতি ঘটলো। এই কলেজে থেকে পাস করে যাওয়া ছেলেদের মধ্যে অনেকেই কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। এমনকি ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, কমার্স প্রভৃতি ফ্যাকাল্টিগুলিতে কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত অবস্থাতেই ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতে কৃতকার্য হয়ে চাকরির রাস্তা পাকা করে নিল।

এই কলেজটির উন্নতির একটা বড় কারণ এর অবস্থানগত সুবিধা। চারটে জেলার কেন্দ্রে অবস্থিত আরামবাগ - বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং হুগলী। এই জায়গাটিকে কেন্দ্র করে যত গ্রাম-গঞ্জ রয়েছে তাদের ছেলে-মেয়েদের লক্ষ্য আরামবাগ কলেজে ভর্তি হওয়া। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার কারণে অনেক অভিভাবক তাঁদের গ্রামের বাড়ি ছেড়ে আরামবাগে বাসা করেছেন। তাছাড়া, আরামবাগের নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে, যা আর পাঁচটা শহর থেকে স্বতন্ত্র। এখানকার মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রায় সকলে সকলকে চেনে, সকলে সকলের খবর রাখে। অন্যান্য শহরের বাসিন্দাদের যেমন আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব থাকে, কেউ কারো খবর রাখে না, পাশের বাড়ির লোককে চেনে না, নিজের নিজের নিয়েই থাকতে ভালোবাসে; এখানে কিন্তু তা নয়। একে অন্যের খবর রাখে, তাদের বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ায়,আনন্দ-দুঃখ ভাগ করে নেয়।এই কারণে আমিও এই জায়গাটাকে খুব ভালোবেসে ফেলি। আমার আদি বাড়ি শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি। আমাকে অনেকেই বলেন, আপনি ও জায়গা ছেড়ে এখানেই জীবন কাটিয়ে দিলেন! আমি কিন্তু চুপ করে থাকি, আর মনে মনে বলি এখানে বেশ তো আছি। আমার প্রথম থেকেই মত, যে কলেজে কাজ করবো, সেই কলেজের আশেপাশে বাস করব, সেই মাটিকেই ভালোবাসবো। এই কারণেই আমি কর্মজীবন শেষ হবার পরও এখানেই থেকে গেলাম।

সবশেষে একটা কথা বলতে চাই, আমাদের কাছে কলেজ শুধু একটা কর্মক্ষেত্র ছিল না, এটা একটা বৃহত্তর পরিবারের মতো ছিল। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এখানেই তফাৎ। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যেমন ব্যাংক, সরকারি অফিস ইত্যাদির ক্ষেত্রে একজন স্টাফ আজ এখানে, কাল সেখানে বদলি হচ্ছেন। ফলে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁরা একাত্ম হতে পারেন না। স্কুল কলেজে যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের কাছে চাকরি ক্ষেত্রটি অনেকটা জায়গা জুড়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের সুদিন-দুর্দিন তাঁদের অনেকখানি প্রভাবিত করে। প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী কলেজে ভর্তি হচ্ছে, আবার পড়াশোনা শেষে বেড়িয়ে যাচ্ছে। এরপর তারা কর্মজীবনে প্রবেশ করছে। যখন শুনি একটি ছাত্র আমাদের কলেজ থেকে পাস করে খুব বড় পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন মনটা আনন্দে ভরে যায়, গর্ব হয়। মনে আছে, একবার কাশ্মীর বেড়াতে গেছি। মোঘল গার্ডেনে অবস্থান করছি। এমন সময় একটি ছেলে এসে প্রণাম করে বলল, স্যার আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। এখন একটি কলেজের অধ্যাপক। গর্বে বুকটা ভরে উঠল। তাই স্কুল কলেজের চাকরিকে আমি একটা নোবেল প্রফেশন হিসাবেই দেখি। আমি আশা করব, প্রত্যেকেই যেন এই মনোভাব নিয়েই চলেন। আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়, যখন শুনি কোনো কোনো অধ্যাপক-অধ্যাপিকা পড়ানোর থেকে রাজনীতিতেই বেশি মনোযোগী হয়ে উঠেছেন, যখন শুনি কলেজের কোনো ফেস্টে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে উদ্দাম নৃত্যে সামিল হয়েছেন, যখন শুনি শিক্ষকের পড়ানোর মান নেমে গেছে। শেষ করছি এই আশা করে যে, এই কলেজ যেন প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর কাছে একটা তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

# নেতাজী মহাবিদ্যালয় - কিছু স্মৃতি

গোলাম মইনুদ্দিন মিধ্যা

প্রায় সাঁইত্রিশ বছর আগে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিই। অবশ্য এর আগে কালিম্পং কলেজে অধ্যাপনা করার সামান্য অভিজ্ঞতা ছিল। তারপর ২০০২ সালে এই কলেজ ছেড়ে অন্যত্র যোগদান করি অধ্যক্ষ হিসাবে। বস্তুতঃ, আমার অতি প্রিয় এই নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা জীবনের সর্বাধিক স্মরণীয় মুহূর্তগুলি স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে সঞ্চিত।

আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয় থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে দু'বার না ভেবে সুদূর বীরভূম থেকে সটান চলে এলাম আরামবাগে; মাথা গোঁজার ঠাঁই নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল না, কারণ আমার অগ্রজ সে সময় আরামবাগ কোর্টে সিভিল জাজ। আমি যোগ দেওয়ার মাস ছয়েক আগে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন অধুনা প্রয়াত বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়। সম্ভবতঃ তাঁর ইস্যু করা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়া আমিই প্রথম ব্যক্তি।

সে যাই হোক সে সময় কলেজের বস্তুগত পরিকাঠামো (Physical Infrastructure) ছিল নিতান্তই সাদামাটা, কিন্তু প্রায় পঞ্চাশ জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, পনেরো-ষোলোটি বিষয়ে অনার্স ও পাশ কোর্স, বিশাল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীসহ পড়াশোনার উপযোগী সামগ্রিক বাতাবরণ ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট বরাবরই ভালো ছিল।

কালিপুর থেকে বালিদেওয়ানগঞ্জ যাওয়ার পিচরাস্তার ডানপাশ ধরে কলেজে ঢোকার যে প্রথম প্রবেশদ্বার তার ডানপাশে একতলা বিল্ডিং-এ পাশাপাশি টিচার্স রুম তৎসহ ক্যান্টিন, তারপাশে লাইব্রেরি, এককোণে ইউরিনাল; পশ্চিমপ্রান্ত বরাবর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত টিনের চালা ঘরে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি; তারপর দক্ষিণপ্রান্তে অধ্যক্ষের চেম্বার, অফিসঘর ও লেডিস কমনরুম সম্বলিত ছোটো দোতলা বিল্ডিং - ওখানকার দোতলায় তখন বোটানি ক্লাসরুম সহ বিভাগীয় প্রধানের চেম্বার। এরপর পূর্বপ্রান্তে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত একতলা ক্লাসরুম বিল্ডিং। এই আয়তাকার সীমানার দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত ফুটবল তথা ক্রিকেট গ্রাউন্ড, মাঠের দক্ষিণে সীমানার ধারে অধ্যক্ষ মহাশয়ের রেসিডেন্স ও এন. সি. সি অফিস।

অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের আমলেই পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রচুর কাজ হয়। পূর্ব প্রান্তের বিল্ডিং-এর দোতলার কাজ সম্পন্ন হয় প্রথমেই। দোতলার দক্ষিণপ্রান্তের ঘরে ঠাঁই হয় বোটানি ল্যাবরেটরির, উত্তর প্রান্তের ঘরে থাকে জুলজি ল্যাবরেটরি। বিজয়বাবু ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী মানুষ - হৈ হৈ করে বেশ খানিকটা রাত্রি

* প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

পর্যন্ত স্থানীয় প্রায় সকল অধ্যাপক ও অফিসকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ছাদ ঢালাইয়ের কাজ পর্যবেক্ষণ করেন। পরবর্তী সময়ে টিচার্সরুম তৎসহ লাইব্রেরি বিল্ডিং-এর দোতলার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় এবং ল্যাবরেটরি বিল্ডিং-এর টিনের ছাদ অপসারণ করে দোতলা ভবন নির্মিত হয়। অধ্যক্ষ মহাশয় ইউ. জি. সি. তথা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করার জন্য কোলকাতা ছোটাছুটি করতে ভালোবাসতেন, ইংরাজীতে ড্রাফ্‌ট লিখতেন চমৎকার। এছাড়া, স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে কলেজের উন্নয়নে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন। স্থানীয় নদীর বালি কিনে ইউ. জি. সি. বিল্ডিং-এর পূর্ব দিকের ফাঁকা জমির ঢালু অংশগুলি ভরাট করে সমতল করা সহ ফুটবল মাঠ সংস্কার করা, ওই মাঠের পশ্চিমদিকে, ক্লাসরুমের অপ্রতুলতা মেটানোর লক্ষ্যে কিছু অস্থায়ী ক্লাসরুম নির্মাণসহ যাবতীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের দিকে তিনি ভীষণ মনোযোগী ছিলেন। এইসময় পশ্চিমমুখী ইউ. জি. সি. বিল্ডিং সংলগ্ন নেতাজী মূর্তির সামনে একটি দর্শনীয় বাগান তৈরি করেন অধ্যাপক প্রণব কুমার দালাল। পরিকাঠামো উন্নয়নের এই ধারা বর্তমান অধ্যক্ষের আমলেও প্রবাহমান এবং মহাবিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবন সহ অন্যান্য পরিকাঠামোর ব্যাপক বিস্তৃতি ও উৎকর্ষের শিখর ছোঁয়া - অন্যান্য মহাবিদ্যালয়ের কাছে ঈর্ষনীয় বটে।

তবে, অধ্যক্ষ হিসাবে প্রশাসনিক কাজকর্মে বিজয়বাবু ছিলেন বেশ জেদি প্রকৃতির এবং বহুক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয়ভাবে অনমনীয়। এ কারণে মাঝে মধ্যে অফিস স্টাফ এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটত প্রকাশ্যে। বিজয়বাবুর সুবিধা-অসুবিধা দুটোই ছিল। কারণ, এই কলেজের বেশ কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপক তাঁর এই কলেজেই আই. এ পড়ার সময়কার শিক্ষক ছিলেন। তাছাড়া, পরিচালন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সুধীর রায়ের শিক্ষা-প্রশাসনের রাজনৈতিক মতাদর্শ-নিরপেক্ষ ও ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি তথা নির্দেশ বহুক্ষেত্রেই মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসনিক জটিলতাকে হালকা করার পথ সুগম করেছিল।

যে কথা বলছিলাম, কলেজের মানবিক পরিকাঠামো (Human Infrastructure) কিন্তু ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের। বিভিন্ন বিভাগে ছিলেন বেশ কয়েকজন প্রবীণ বিদগ্ধ অধ্যাপক। টিচার্স কাউন্সিল-এর সিদ্ধান্ত ছিল, অধ্যক্ষের সঙ্গে যাই মতানৈক্য হোক না কেন পঠন-পাঠনে যেন কোনো বিঘ্ন না ঘটে। নিয়মিত ক্লাস নেওয়া, পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি করা, পরীক্ষার হলে ইনভিজিলেশন দেওয়া, খাতা দেখা, মূল্যায়ণের পর সময়ে মার্কস জমা দেওয়া, পরীক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের 'সাজেশন' তৈরি করে দেওয়া - এসব কাজে কোনও শিক্ষক পারতপক্ষে গাফিলতি করতেন না। পরীক্ষা হলে নকল রোধ তথা টুকলি ধরায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন অধ্যাপক শক্তিপদ মান্না; তিনিই আবার সাধারণত পরীক্ষা পরিচালনার দুরূহ কাজ সফল ভাবে পালন করতেন। অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় আচার্য পরীক্ষার হলে কেউ অসদুপায় অবলম্বন করার চেষ্টা করছে মনে হলে সতর্ক করতেন - 'কারো কারো মধ্যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।' সাধারণভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ন্ত বেলা

পর্যন্ত ক্লাস করায় আগ্রহের অভাব ছিল না। মনে আছে বিকালের দিকে ক্যারম খেলতে গিয়ে বা চা খেতে গিয়ে কোনো ক্লাসে যেতে দেরি হলে ছাত্র-ছাত্রীরা স্টাফরুমের দরজায় উঁকি দিত - সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বলতেন - 'চল যাচ্ছি'।

কলেজে টিচার্স রুমের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত আন্তরিক ও মনোরম। অফ পিরিয়ডে প্রবীণ অধ্যাপকেরা নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও পেশাগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। অধ্যক্ষ বিজয়বাবু চেম্বার ছেড়ে সাধারণত বাসায় গিয়ে লাঞ্চ করে ফিরে এসে টিচার্স রুমে আড্ডা দিতে আসতেন। নানা গুরুগম্ভীর আলোচনা চলত। আমার 'হেড' অর্থাৎ অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায় চোস্ত ইংরাজী বলতেন, অকাট্য সব যুক্তি খাড়া করতেন। কয়েকজন বাংলার অধ্যাপক অ্যাটেনডেন্স রেজিস্টারে 'অফ ডে.-র পরিবর্তে অনুবাদ করে লিখতেন - 'কর্মমুক্তি দিবস'। সংস্কৃতের অধ্যাপক প্রণব কুমার দত্ত সই করতেন - 'প্রকুদ' লিখে। বাংলার অধ্যাপক রবীন আদক Zoology-র Head কে মজা করে বাংলায় তর্জমা করে বলতেন - 'পশুপতি'। টিচার্স রুমে বাংলা ব্যাকরণ বা শব্দের মর্মার্থ নিয়ে আলোচনা হলে সংস্কৃতের অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় আচার্য কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না। 'প্রভুতা' ও 'প্রভুত্ব' নিয়ে একদিন অধ্যক্ষের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক ছিল বেশ চিত্তাকর্ষক। দোলযাত্রা-হোলি উৎসবে প্রথমদিন ছুটি থাকলেও দ্বিতীয় দিন কলেজ খোলা থাকত। সেদিন রাস্তাঘাটে রঙ মাখিয়ে দেওয়ার ভয়ে বর্ধমান থেকে কোনো টিচার কলেজে আসতেন না। ব্যতিক্রমী চরিত্র হিসাবে শুধু হাজির হতেন মৃত্যুঞ্জয়বাবু; হোলির রঙে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত জামা-কাপড়-ধুতি পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হতেন অধ্যক্ষের সামনে, ওইদিন ছুটি না দেওয়ার প্রতিবাদ জানাতে। সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক প্রণব দত্ত ছাত্র-ছাত্রীদের হাজিরা-খাতা হাতে গোটা কলেজ চক্কর দিতেন ক্লাস নেওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রী খুঁজতে (তখন সংস্কৃত বিভাগে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল অত্যল্প)। আংশিক সময়ের অধ্যাপক নব ঘোষ-এর ক্লাস লেকচার শোনা যেত স্টাফ রুমে বসে (গলার আওয়াজ ছিল এতোই জোরালো)। ইতিহাসের অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সিনহা-র আবার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি স্নেহের আতিশয্য এতোটাই ছিল যে, ক্লাসের নির্ধারিত সময়ের পরেও ক্লাসরুম থেকে টিচার্সরুম পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা পেছন পেছন ধাওয়া করতো, প্রশ্ন করে যেত আর উত্তর শুনে যেত; ছোটো গল্পের মতো মনে হত - 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'।

বৃষ্টি-বাদলা তথা দুর্যোগের দিনে কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি নগণ্য হলে আধবেলার পর কলেজ প্রায় ফাঁকা হয়ে যেত। কিন্তু অধ্যক্ষের নিদান মেনে পাঁচ ঘন্টা কাটিয়ে বিকাল তিনটে পনেরো-র আগে কেউ বেরোতেন না। অগত্যা দর্শন শাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক সিতাংশু দত্ত 'গুপি গাইন বাঘা বাইন'-এর দু'চার কলি গেয়ে উঠতেন। বাংলার অধ্যাপক রমাপ্রসাদ ঘোষ গাইতেন পদাবলী কীর্তনের দু'চার কলি। অধ্যাপক প্রণব কুমার দালাল, দেবপ্রসাদ সামন্ত, নিখিল রায়, রথীন হাজরা, অমলেন্দু সামুই, নব ঘোষ, মুরারী মোহন মান্না

প্রমুখ কয়েকজন এবং আমি ক্যারম খেলায় মগ্ন হতাম। অন্যান্য দিনেও অফ পিরিয়ডে আমাদের সময় কাটতো মূলত ক্যারম বোর্ড ঘিরে। একবার আমি ও প্রণব কুমার দালাল জুটি এবং দেবপ্রসাদ সামন্ত ও নিখিল রায় জুটি চাঁপাডাঙ্গা কলেজের আমন্ত্রণে ক্যারম কম্পিটিশনে গিয়ে ওদের কলেজের দুই বেস্ট অধ্যাপক জুটিকে হারিয়ে এসেছিলাম।

কলেজে অধ্যাপক দেবপ্রসাদ সামন্ত ছিলেন 'মুশকিল আসান' - সকলের নানাবিধ সমস্যা মেটানোর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতেন আন্তরিকতার সঙ্গে। অধ্যাপক মুরারী মোহন মান্না ছিলেন এক বর্ণময় চরিত্র; কমবয়সী অধ্যাপকদের সঙ্গে দিলখোলা মেজাজে মিশতে পারতেন। ক্যারম খেলতে খেলতে হালকা 'মিস' করলেই পার্টনারকে আদুরে গালাগালি (ব্যাখ্যান) করতে ছাড়তেন না। ফিজিক্স-এর ভাস্কর নায়েক আবার ইচ্ছে করে গালাগালি খাওয়ার জন্য ক্যারম খেলা চলাকালীন দুষ্টুমি করে কখনো কখনো বোর্ডের ঘুটিগুলোকে হাত দিয়ে ঘেঁটে এলোমেলো করে দিতেন, বলতেন - 'ভণ্ডুল করে দিই'। এদিকে দুই বন্ধু গ্রন্থাগারিক অরুণ গুপ্ত আর জুলজি-র গোলক বিহারি হাজরার মধ্যে গুঁতোগুঁতি , ঠেলাঠেলি, খুনসুটি লেগেই থাকতো।

কলেজ থেকে প্রতি বছর জানুয়ারির শেষাশেষি ফ্যামিলি ট্যুর ও পিকনিক হতো। দীঘা, মুকুটমণিপুর, পাল্লা রোড, কামারপুকুর-জয়রামবাটী, নবদ্বীপ-মায়াপুর, মাইথন, জয়পুর ফরেস্ট, চাঁদুর ফরেস্ট, ওড়গ্রাম ফরেস্ট, ভাল্কি মাচান, একলক্ষী নদীতীর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানে যাওয়া হতো বাস রিজার্ভ করে; সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হতো রান্নার ঠাকুরের টিম। অধ্যক্ষের প্রবল উৎসাহ এবং মূলত অধ্যাপক শক্তিপদ মান্নার ব্যবস্থাপনায় ও বেশ কয়েকজন উৎসাহী অধ্যাপকের সহযোগিতায়, উপযুক্ত জায়গা বাছাই করে, ত্রিপল-সতরঞ্জী বিছিয়ে, মুড়ি, তেলেভাজা, কাঁচা মটরকলাই, নারকেল কুচি, পেঁয়াজ কুচি সহযোগে টিফিন, তারপর চা-কফি আর দুপুরে রান্না করা গরম গরম মাছ-মাংস সহযোগে আহার, একটু আধটু এদিক-ওদিক ঘোরা - এসবের বন্দোবস্ত হতো।

কচিকাঁচাদের আব্দারে প্রতিবছরের ট্যুর - পিকনিকে উপস্থাপিত হতো অধ্যাপিকা অনিতা হাজরা (বিয়ে-পাগলা প্রতিবন্ধী কন্যা চরিত্রে) আর অধ্যাপিকা যশোধরা দাঁ (ঐ কন্যাদায়গ্রস্ত মাতার চরিত্রে) অভিনীত হাস্যকৌতুক নাটিকা। কন্যার রান্নার কাজের পারদর্শিতার অঙ্গভঙ্গী সংযোগে সংলাপ - 'সবজি কুটছি তো কুটছি, কুটছি তো কুটছি ...' সেলাই-এ পারদর্শিতার সংলাপ - 'সেলাই করি মায়ের লুঙ্গি, বাবার সায়া আরো কত্তো কি ...।' বাচ্চারা দেখে শুনে হেসে গড়াগড়ি খেতো, বড়োরাও তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতো। এছাড়া ছিল অধ্যাপক তরুণ ঘটকের বাঁকুড়ার ভাষার সহযোগে লক্ষণ-সীতার স্বর্ণ-মৃগ ধরার দৃশ্যে অভিনয়। সীতার সংলাপ - 'আমি সোনার হরিণ টো লুবো', লক্ষণের সংলাপ - 'উটো হরিণ লয়, ঘোষেদের কাঁড়া বটেক'।

মাইক্রোফোন সহযোগে গানের আসরও বসত। আসা ও যাওয়ার সময় বাসের মধ্যেও চলতো। আধুনিক ও লোক সংগীতে অধ্যাপক প্রণব দালাল, নজরুল গীতিতে গ্রন্থাগারিক অরুণ গুপ্ত, হিন্দী গানে আমি, মান্না দে-র গানে অধ্যাপক পরমার্থ ঘোষ - বিশেষতঃ প্রতি বছর 'কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই' তাঁকে গাইতে হতো সবার দাবিতে। বিক্ষিপ্ত ভাবে আরো কেউ কেউ গাইতেন। অধ্যাপক বিশ্বনাথ গড়াই যোগ দেবার পর বাউল গানও চালু হয়।

আসরে আরো এক মজার দৃশ্য দেখা যেত - বলিষ্ঠ চেহারার অধ্যাপক দুলালচন্দ্র মাল এবং দুর্বল চেহারার নবকুমার ঘোষ-এর মধ্যে 'ভোজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা'। অবাক করার মতো বিষয় হল 'টাই' (Tie) রেজাল্ট। দুজনেই প্রায় এক-দেড় কিলো পরিমাণ আহার করতেন। পিকনিক থেকে ফেরার আগে সবার জন্য আরো এক প্রস্থ চা-কফি হতো। সারাদিনটা বড়ো আনন্দে কেটে যেত। কবিতার লাইনের মতো আফশোষ হতো - 'that day so soon has glided by'।

অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ব্যক্তিগত শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে একটি কথা না বলে থাকা যায় না। আমরা কলেজে তাঁকে কোনোদিন সিগারেট খেতে দেখিনি। একবার কি একটা কারণে অধ্যাপক প্রসেনজিৎ শর্মা (দুর্গাপুর থেকে আসতেন) ও দীপকবাবু (পাইকপাড়া, কোলকাতা থেকে আসতেন) দিনের শেষে বাড়ি ফিরে যেতে না পেরে কলেজের টিচার্স কোয়ার্টারে রাত্রিযাপন করেন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর প্রসেনজিৎ দীপকবাবুকে সিগারেট খেতে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করে - স্যার, আপনি তো সিগারেট খান না! উত্তর এল - তুমি আমাকে এর আগে রাত্রে কখনও দেখোনি; আমি রাত্রে ভাত খেয়ে দুটো সিগারেট খাই, তারপর একটা ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়ি।

আমাদের মতো বেশিরভাগই বর্ষাকাল বাদ দিয়ে নদী পেরিয়ে শর্টকাটে কলেজ পৌঁছতাম। দীপকবাবু হেঁটে হেঁটে ব্রিজ পেরিয়ে কলেজ আসতেন। তাঁর লাঞ্চ বক্সে থাকতো বাড়ি থেকে আনা গোটা চারেক আটার রুটি, বেগুন ভাজা, মাছ ভাজা; কাঁটা-চামচ দিয়ে খাওয়া সেরে ক্যান্টিনের উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়তেন - 'উপেনবাবু এক কাপ চা'। পরিপাটি ড্রেস, চোস্ত ইংরাজী, ফর্সা গায়ের রঙ, খাটো উচ্চতার দীপকবাবুকে মনে হতো 'মিনি সাহেব'।

১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত নেতাজী মহাবিদ্যালয় সুদীর্ঘ পঁচাত্তর বছরের পথ অতিক্রম করে প্ল্যাটিনাম জুবিলী বর্ষে উপনীত। এতদুপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকা পত্রিকায় স্মৃতিচারণা করবার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হচ্ছি। মনে পড়ে অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়-এর আমলে ১৯৯৭ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একশো বছর পূর্তি পালিত হয় মহা সমারোহে, নানাবিধ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষাকর্মী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসহ এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সারা আরামবাগ শহর পরিক্রমা করে। আমি অধ্যক্ষ হয়ে

২০০২ সালে চলে যাওয়ার সময়কার কলেজ আর বিগত বিশ বছরে আমুল বদলে যাওয়া কলেজের মধ্যে আসমান-জমিন ফারাক। নতুন নতুন পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি, অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত ঝাঁ চকচকে ও সুবিশাল প্রশাসনিক ভবন, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট-এর পৃথক অথচ স্বয়ং-সম্পূর্ণ অবস্থান, অত্যাধুনিক সেমিনার হল, গেষ্ট হাউস, ক্যান্টিন ইত্যাদি সম্বলিত কলেজের সামগ্রিক বর্তমান রূপ অবশ্যই তৃপ্তিদায়ক। গর্ব হয়, একদা এই কলেজে পড়িয়েছি। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন শিক্ষাকর্মী ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকাসহ অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় প্রয়াত হয়েছেন; এঁদের সকলের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আর স্বাগত জানাই কলেজে যোগ দেওয়া নয়া প্রজন্মকে।

# আমার অনুভবে ও স্মৃতিতে প্রিয় নেতাজী মহাবিদ্যালয়

পরমার্থ ঘোষ

আমি তখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে গবেষণা করি, আর সাথে কলেজে আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করি। সিউড়ির বীরভূম মহাবিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের অধ্যাপনা ছেড়ে একজন অধ্যাপকের Lien-এর শূন্য পদে কলেজ সার্ভিস কমিশনের প্রেরিত বদলি অধ্যাপক হিসাবে বর্ধমান বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে কাজ করার পর জানতে পারলাম যে, আরামবাগের নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে সেই শিক্ষাবর্ষ থেকেই ভূগোল বিষয় খোলা হবে। খবর নিতে গিয়ে জানতে পারলাম যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ সার্ভিস কমিশনের কাছে অধ্যাপক চেয়ে পাঠিয়েছেন। আমাকে বলা হল স্থায়ী অধ্যাপক খুব দ্রুতই আসবে, ততদিন ছাত্রদের ক্লাস চালিয়ে নেবার জন্য একজন অধ্যাপক নিয়োজিত হবেন। যা হোক, ১৯৯০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কলেজে যুক্ত হলাম আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসাবে।

প্রথমদিনেই কলেজের ইউ. জি. সি. বিল্ডিং-এর একতলার ৬ নং ঘরে একটি সভা হচ্ছিল, সম্ভবত এন. সি. সি-র উদ্যোগে। রাশভারী ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত, বেশ সমীহ করার মতো ব্যক্তিত্বের অধিকারী অধ্যক্ষ শ্রী বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ। উনি ওই ঘরভর্তি সভায় আমাকে সবার সাথে আলাপ করিয়ে দিয়ে কিছু বক্তব্যও রাখতে বললেন এবং আমি তাঁর আদেশ পালনও করলাম। সভা শেষে একজন সিনিয়র অধ্যাপক এগিয়ে এসে বললেন, 'তুমি অগ্নিপরীক্ষায় বেশ ভালভাবেই উৎরে গেছো।' সেই শুরু, তারপর ডিসেম্বর মাসে আমার নামে স্থায়ী অধ্যাপকের জন্য চিঠি এল কলেজ সার্ভিস কমিশন থেকে। আমি ৫ই জানুয়ারি, ১৯৯১ নেতাজী মহাবিদ্যালয়ে যোগ দিলাম ভূগোলের প্রথম স্থায়ী অধ্যাপক হিসাবে। পূর্বেকার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভাগীয় ল্যাবরেটরির ফার্ণিচার, আলমারি প্রভৃতি তৈরি করানো হল; জরুরী যন্ত্রপাতি, মানচিত্র, অঙ্কন সামগ্রী প্রভৃতি কেনা হল। এভাবেই আমাকে দিয়ে শুরু হল আরামবাগ মহকুমার প্রথম Undergraduate ভূগোল বিভাগ। সেই অর্থে আমি হলাম মহকুমার প্রথম ভূগোলের অধ্যাপক।

আমি অনেককেই বলেছি যে, নেতাজী কলেজে আমি খুব ভাগ্যবান অধ্যাপক যে অধিকাংশ সিনিয়র অধ্যাপকদের সান্নিধ্য পেয়েছে। আমি সান্নিধ্য পেয়েছি অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ কর, ব্রজেশ দাস, সিতাংশু দত্ত, ড. কমলকৃষ্ণ সরকার, সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য, আদিত্য চ্যাটার্জী, দীপক ভট্টাচার্য্য, পীযূষকান্তি পাল, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, নিশীথভকত চৌধুরী, অম্বুজ বসু, রবীন আদক, রথীন্দ্রনাথ হাজরা, প্রণব দত্ত, দেবপ্রসাদ সামন্ত, শশধর কোলে, মুরারিমোহন মান্না, দুলাল মাল, শক্তিপদ মান্না, রমাপ্রসাদ ঘোষ সহ আরো অনেকের। প্রায় সকলেই

* প্রাক্তন অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

কিন্তু আন্তরিকভাবে আমাকে গ্রহণ করেছিলেন বলে আমার মনে হয়। আমিও আগে থেকেই কলেজে পড়ানো এবং সহকর্মীদের প্রতি আচরণের বিষয়ে কিছুটা অভিজ্ঞ বলে সম্ভবত খুব তাড়াতাড়িই মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম। মনে আছে, পরের বছরই ফেব্রুয়ারি মাসে কোন্নগরে আমার বিবাহের অনুষ্ঠানে এক ঝাঁক সিনিয়র সহকর্মীকে পেয়েছিলাম বলে খুব আনন্দ হয়েছিল। স্থায়ী অধ্যাপক হিসাবে যোগদানের কয়েকদিনের মধ্যেই অধ্যাপক ড. প্রণবকুমার দালাল, নিখিল রায় প্রমুখদের উদ্যোগে দীঘাতে যে পিকনিকের আয়োজন হয়েছিল, তাতে আমরা দারুণ আনন্দ করেছিলাম। ওল্ড দীঘায় বাসের পাশে গ্যাসের উনুন জ্বালিয়ে শক্তিদা, প্রসেনজিৎদা, নবদা, নিখিলদাদের লুচি ভাজার কথা এখনও সুখস্মৃতি হয়ে আছে। কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে আমার পূর্বপরিচিত ছিলেন দেবপ্রসাদ সামন্ত ও গোপাল সিনহা, আর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিল আশীষদা (পাল)। ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার সময় থেকে। বর্ধমান থেকে যাতায়াত করার সুবাদে তাড়াতাড়িই বন্ধুত্ব হয়ে গেল অনিতাদি, যশোধরাদি, রীতাদি, মইনুদ্দিনদা, নবকুমারদা, অভিজিৎদা, স্বপনদা, প্রসেনজিৎদার সাথে। বর্ধমান থেকে কলেজে আরও আসতেন মনমোহনদা, বিমলেন্দুদা, সৃষ্টিধরবাবু, আনন্দবাবু, মৃত্যুঞ্জয়বাবু ও ভাস্করদা। বেশ মজা করে একটি বছর বর্ধমান থেকে যাতায়াত করলাম। কিন্তু পরের বছরই সাংসারিক কর্তব্য পালনের জন্য বাধ্য হলাম আরামবাগেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতে। তাও প্রথম আটবছরের বেশি সময় আমি থেকেছি আমার দুই সহকর্মী রথীনবাবু ও শক্তিপদ মান্নার বাড়িতে।

আমি একটা কথা মুক্তকণ্ঠে বলতে চাই, নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সামগ্রিক ফ্লেভারটাই আলাদা রকমের; এর একটা ঐতিহ্য আছে - কী পড়াশোনায়, কী সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতায়, কী সহকর্মীদের মধ্যে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এমনকি সহকর্মীদের পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

আমাদের প্রিয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিম্ন-দামোদর অববাহিকার একটি প্রাচীন ঐতিহ্যশালী প্রতিষ্ঠান (স্থাপিত ১ আগষ্ট, ১৯৪৮), যা দ্বারকেশ্বর নদের পশ্চিমের পলিসমৃদ্ধ সমভূমিতে অবস্থিত। কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্যভাগে অবস্থিত কালিপুর নামের একটি প্রাচীন জনপদে (বিষ্ণুপুর মৌজা) অবস্থিত এই মহাবিদ্যালয়। একসময় এই জনপদটি বাণিজ্যিক দিক থেকেও বেশ উন্নত ছিল, তখন আরামবাগ শহর যুক্ত থাকতো বাঁশের নির্মিত একটি সেতুর মাধ্যমে। কিন্তু দ্বারকেশ্বর নদীর উপরে 'রামকৃষ্ণ সেতু' তৈরির পর থেকে জনপদটির দোকানপাট, বাজার এবং জমজমাট অবস্থা কমতে শুরু করে, আর আরামবাগ শহর সবদিক থেকে প্রসারিত ও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কালিপুরের কাছে বালীদেওয়ানগঞ্জ অঞ্চলে একসময় কাঁসা-পিতলের বাসন নির্মাণের কুটীর শিল্পের রমরমা ছিল, যা ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়েছে। তখনও গার্লস কলেজ তৈরি হয়নি, তাই আমাদের কলেজের পশ্চাদ্‌ভূমি বা **hinterland** ছিল বেশ প্রশস্ত। অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ এবং তৎকালীন পরিচালন সমিতিগুলির উদ্যোগে

মহাবিদ্যালয় বড় হতে থাকলো, নতুন নতুন বিষয় খোলা হতে থাকলো। আমার নিয়োগের সময় পরিচালন সমিতির সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক সুধীর রায়, বর্ধমানের সাংসদ; পরবর্তীকালে সভাপতি হন প্রাক্তন বিধায়ক শ্রী বিনয় দত্ত মহাশয়। অধ্যক্ষ বিজয়বাবুর সময়ে রসায়ন বিভাগের টিনের চালার বাড়িটি ভেঙে রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় তৈরি হল পাকা বিল্ডিং, আর আমার যোগদানের আগেই তৈরি হয়েছে দ্বিতল ইউ. জি. সি. বিল্ডিং। আগেকার লাইব্রেরি ও শিক্ষক স্টাফরুমের উপরেও দ্বিতল তৈরি করে গেলেন বিজয়বাবু, তৈরি করলেন গার্লস হোস্টেলের প্রথমতল। এই সময় কলেজের এন. এস. এস. ছিল বেশ শক্তিশালী, আর এতে নিখিলদার (রায়) ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মতো। কলেজের নিজস্ব প্রেস, কলেজের নামে ডাকঘর - এগুলো ছিল মুকুটের পালকের মত। কলেজে অধিকাংশ বিষয়েই পড়াশোনা ভালো হলেও কয়েকটি বিষয়ের সুনামের ব্যাপ্তি ছিল উল্লেখযোগ্য। এই তালিকায় থাকা বিষয়গুলির মধ্যে আলাদাভাবে বাণিজ্য, বাংলা, প্রাণীবিদ্যা, অঙ্ক প্রভৃতির কথা বলতেই হবে।

কলেজে যোগদানের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই সিনিয়র শ্রদ্ধেয় সহকর্মীরা এক এক করে অবসর নিতে শুরু করলেন, আর আমাদের মত কম বয়সীদের কাঁধের উপর নানা দায়িত্ব এসে পড়তে থাকলো। প্রথমে আমাকে তৎকালীন একমাত্র অধ্যাপক সংগঠন ওয়েবকুটার কনভেনরের দায়িত্ব দেওয়া হল, পরবর্তীকালে প্রায় পাঁচ বছর শিক্ষক সমিতির সম্পাদক, ছয় বছর পরিচালন সমিতির সদস্য এবং আরও পরে নানা দায়িত্ব নিতে হল। অধ্যক্ষ বিজয়বাবুর আমলে মহাবিদ্যালয়ের যে উন্নতি শুরু হয়, তাতে আমরা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা সক্রিয়ভাবে সঙ্গী ছিলাম। বিজয়বাবু ছিলেন উদ্যোগী একজন অধ্যক্ষ, যিনি ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়মানুবর্তিতার প্রতি বিশেষভাবে নজর দিতেন। করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ্য রাখতেন ঠিকমতো ক্লাস হচ্ছে কিনা। আবার মাঝে মাঝে সহকর্মীদের সাথে স্টাফরুমে গল্প জুড়ে দিতেন, বেড়ানো বা পিকনিকেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন। পরিবারের সকলকে নিয়ে পিকনিক করার ফলে সহকর্মীদের পরিবারগুলির মধ্যে সুমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একসময় শিক্ষকস্বার্থ সংক্রান্ত নানা বিষয়ে একমত না হতে পেরে অধ্যক্ষের সাথে কর্মস্থলে আমাদের মনোমালিন্য ও সংঘাতও কম হয়নি। কিন্তু সকলের কাছেই কলেজের স্বার্থ ও উন্নয়নই ছিল প্রধান বিষয়। আর অধ্যক্ষের অবসরের পর উক্ত মনান্তরও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আমাদের তৎকালীন আরও বেশ কয়েকজন সহকর্মী ছিলেন অমলেন্দুদা, চিত্তদা, তরুণদা, সুনীলদা, পূর্ণানন্দদা, ভাস্করদা, অমরদা প্রমুখ - এদের কথাও আজ মনে পড়ছে। একসময় অধ্যাপক পরিমল হাজরা, মনি নন্দী, গোলকবিহারী হাজরা - এদের কর্মমুখী ভূমিকাও কম ছিল না। তবে শিক্ষকদের নানা সমস্যা ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমি সবসময় আলোচনা করে নিতাম মইনুদ্দিনদা, নিখিলদা, প্রসেনজিৎদা, অজিতদার সাথে। বন্ধু গোপাল সিনহা, ভাই-এর মতো তারক রায়, জীবন পাল, উদয় নন্দী, সুব্রত চ্যাটার্জী, তিলকনাথ ঘোষ, সুমিতা দাস, অরুনিমা দত্ত - প্রত্যেকেই

ছিল কলেজের প্রতি বিশেষ দায়িত্বশীল ও নিষ্ঠাবান।

আজ একটি বিষয়ে আমার সাথে নিশ্চয়ই তৎকালীন অধ্যাপকেরা একমত হবেন যে, নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের নিয়মানুবর্তিতা তৈরির ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ বিজয়বাবুর ভূমিকা চিরকাল প্রশংসা পাবে। আমরা শিক্ষক প্রতিনিধিরা তাঁর সাথে বসে সর্বপ্রথম '৫ ঘন্টা ৫ দিন' ক্লাসের সরকারি নিয়মটি চালু করি। বিজয়বাবু অধ্যক্ষ থাকাকালীন কলেজে বেশ বড় দুটি অনুষ্ঠান হয়। একটি হল 'অল বেঙ্গল প্রিন্সিপাল কাউন্সিল'-এর রাজ্য সম্মেলন, যেখানে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক সত্যসাধন চক্রবর্তী এসেছিলেন। অপর অনুষ্ঠানটি ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবর্ষ পালন। এই অনুষ্ঠানে বেশ উন্নতমানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর কথা আজও সকলের মনে আছে। এইসব অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা স্যার আজ আর ইহজগতে নেই। আজ আমার পরলোকগত অনেক সহকর্মীর মত স্যারকেও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই। চাকরি জীবনের শেষ দিকে তিনি নেতাজী মহাবিদ্যালয় সহ অসংখ্য স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, সমাজসেবী, শিক্ষাব্রতী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার জন্য তৈরি করেছিলেন 'ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল স্মৃতিরক্ষা সমিতি' এবং আমরণ তিনি ছিলেন এর সম্পাদক।

২০০৩ সালের মার্চ মাসে আমাদের কলেজে যোগদান করলেন আমাদের পূর্ব পরিচিত দাদার মতো চাঁপাডাঙ্গা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের বাণিজ্যের অধ্যাপক ড. অসীমকুমার দে। স্থানীয় মানুষ, উদ্যোগী, নিষ্ঠাবান, দায়িত্বশীল এবং আপাদমস্তক একজন ভদ্রলোক। প্রথমে রাজী না থাকলেও আমাদের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত অসীমদা সার্ভিস কমিশনে আবেদন করলেন এবং অধ্যক্ষরূপে নিয়োজিত হলেন। তখন থেকে কলেজের আর এক পর্ব শুরু হল। আমাদের কাছাকাছি বয়সী অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় অসীমবাবুর সুযোগ্য নেতৃত্বে মহাবিদ্যালয়টি কলেবরে, বিষয় বৈচিত্র্যে, পরিকাঠামোগত প্রাচুর্যে - সবদিক থেকেই সমৃদ্ধ হতে শুরু করলো। প্রাথমিকভাবে যোগদানের পরেই বেশ অর্থ সংকটের মধ্যে কাটাতে হলেও বাণিজ্য বিষয়ের অধ্যাপক অসীমবাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলেজের আর্থিক স্বাস্থ্য দ্রুত পাল্টে যেতে থাকলো। ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের ডক্টরেট অসীমবাবুর বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে সকলকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার ক্ষেত্রে। আমিও এই সময় পরিচালন সমিতির সদস্য ছাড়াও দায়িত্ব নিলাম NAAC কমিটির কোঅর্ডিনেটর হিসাবে। সমস্ত অধ্যাপক, বিশেষ করে অধ্যাপক শক্তিপদ মান্না, অধ্যাপক উদয় নন্দী ও অধ্যাপক তারকনাথ রায় এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের ঐকান্তিক সহায়তায়, অধ্যক্ষ সহ পরিচালন সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৭ সালে আমাদের কলেজের NAAC দ্বারা মূল্যায়ন হল এবং আমরা $B^{++}$ গ্রেড পেলাম, নম্বর পেলাম ২.৮৬। কিছু খামতি থাকায় A গ্রেড (৩.০) পাওয়া সম্ভব না হলেও সামগ্রিক বিচারে ফলাফল খুব মন্দ হলো না। কোঅর্ডিনেটর হিসাবে সকলের সহায়তায় NAAC দ্বারা প্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন করানো এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা, আর এরজন্য আমি

অবশ্যই গর্বিত থাকবো চিরকাল।

NAAC মূল্যায়ণের পর আবার শুরু হলো আমাদের দুর্বলতাগুলোকে কীভাবে সমাধান করা যায় তার প্রচেষ্টা অর্থাৎ কলেজের প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ঘটানোর জন্য লাগাতার পরিশ্রম করা। ইতিমধ্যে প্রথমে নিখিলবাবুর (রায়) দেওয়া সাহসে ভর করে আমাদের সকলের সহায়তায় অধ্যক্ষ অসীমবাবু উদ্যোগ নিলেন খড়ের চালা হটিয়ে সুদীর্ঘ 'বিজয় মোদক ভবন' নির্মাণের, যা পরবর্তীকালে ত্রিতল হয়েছে। আর্থিক সাহায্য করলেন পরিচালন সমিতির সভাপতি এবং বিধায়ক শ্রী বিনয় দত্ত মহাশয়। তিনিও আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাঁকে এই প্লাটিনাম জুবিলির সময়ে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। অসীমবাবুর উদ্যোগে আরও তৈরি হল ইউ. জি. সি বিল্ডিং-এর তৃতীয়তল, রসায়ন বিল্ডিং-এর ২য় ও ৩য় তল, হেরিটেজ বিল্ডিং-এর উপরে অত্যাধুনিক গেস্ট হাউস, নতুন প্রশাসনিক ভবন ও অডিটোরিয়াম, গার্লস হোস্টেলের সম্প্রসারণ, সুদৃশ্য দোতলা লাইব্রেরি বিল্ডিং, নদীর ধারে নতুন ছাত্রাবাস, ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স (ইউ. জি. সি), পুরাতন ছাত্রাবাসের পাশে জমি ক্রয় করে নতুন ছাত্রাবাস তৈরি প্রভৃতি উদ্যোগগুলি এক এক করে রূপায়িত হয়েছে। ইতিমধ্যে রসায়ন বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগের আরও প্রসার ঘটেছে। অধ্যক্ষ অসীমবাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় মানুষ ও বর্তমান অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের সক্রিয় অংশগ্রহণে কলেজের পাশে জমিজমা ক্রয় করা হয়েছে এবং কলেজ মাঠের বিপরীতে রাস্তার ধারে তৈরি হচ্ছে সুবিশাল 'প্ল্যাটিনাম জুবিলি ভবন'। আর এইসব উন্নয়নমূলক কাজে কলেজের বিশেষ বন্ধু হিসাবে কাজ করেছেন বর্তমান পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা বিধায়ক শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয়।

মহাবিদ্যালয়ের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে উন্নত আধুনিক ল্যাবরেটরি, উন্নত ইন্টারনেট ব্যবস্থা এবং অনেকগুলি কম্পিউটার ল্যাবরেটরিও তৈরি হয়েছে। সুন্দর ফুলবাগান, ফলের বাগান ও আমবাগান রয়েছে কলেজে। খেলাধূলা, গানবাজনা, সাঁওতালি সংস্কৃতির অনুশীলন, পুঁথিপত্র সংরক্ষণ প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রশংসার যোগ্য এই মহাবিদ্যালয়। আজ কম্পিউটার সায়েন্স, বি. সি. এ, বি. বি. এ-র মতো বৃত্তিমুখী বিষয় এখানে পড়ানো হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম. এ পড়ানোর একটি অন্যতম সেন্টার হল এই কলেজ। তাছাড়া জলপরীক্ষা কেন্দ্রটিও উল্লেখযোগ্য। এন. সি. সি., এন. এস. এস. প্রভৃতির সুবিধা ছাড়াও ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় ও নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দুটি কেন্দ্রে নানা বিষয়ে অনার্স ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ানোর ব্যবস্থা এখানে রয়েছে। উল্লেখ থাকে যে দুটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র স্থাপিত হয় পূর্বেকার অধ্যক্ষ বিজয়বাবুর সময়ে। পরবর্তীকালে অসীমবাবুর সময়ে এই দুই কেন্দ্রের পরিকাঠামোগত উন্নতি হয়। একসময় IGNOU কেন্দ্রটি কয়েক মাসের জন্য ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও অসীমবাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আমাকে কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্ব দেবার মাধ্যমে এর পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং বর্তমানে ড. বিশ্বনাথ গরাই-এর নেতৃত্বে

এই কেন্দ্রটি এবং ড. তিলকনাথ ঘোষের নেতৃত্বে NSOU কেন্দ্রটি সুন্দরভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

অসীমবাবু অধ্যক্ষ হিসাবে আসার পর আরও দুটি বিষয় কলেজে বেশ গুরুত্ব পায় - একটি হল নানা মাপের ও মানের সেমিনার / কনফারেন্স এবং অপরটি হল এক্সকারশান বা শিক্ষামূলক ভ্রমণ। ড. প্রণব দালাল মহাশয়ের কনভেনরশিপে প্রথম মেগা সেমিনার ছিল 'Human Rights and Human Development' বিষয়ক, যা এলাকায় সাড়া ফেলে দিয়েছিল। পরবর্তীতে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে নানা সেমিনার কলেজে অনুষ্ঠিত হয়, যার ধারা এখনও প্রবহমান। ছাত্রছাত্রীদের বাস্তবতাবোধসম্পন্ন আধুনিক মানুষ হতে শিক্ষামূলক ভ্রমণগুলিরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কলেজের আর একটি উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামোগত বিষয় হল 'এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি', যা অধ্যক্ষ বিজয়বাবুর আমলে চালু হয়, আর অধ্যক্ষ অসীমবাবুর সময়ে সবিশেষ উন্নতি লাভ করেছে। ভাবতে ভালো লাগে এটিকে গতি দেবার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান হিসাবে বেশ কয়েক বছর আমারও কিছু ভূমিকা ছিল।

এই অবকাশে বর্তমান সময়ের অধ্যাপক যাঁরা আমার সহকর্মী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অমিত তেওয়ারী, প্রদীপ পাল, সোনালী মজুমদার, সন্তু ভালুক, নন্দিতা ভুক্ত, মহামায়া লাহা, টুনু, কৃশানু, তীর্থঙ্কর, রামানুজ, অজিত, সুজিত, সামিম, প্রদীপবাবু (আঢ্য), বাসুদেব, শিউলি, করমচাঁদ, অনিন্দ্য, ভূগোল বিভাগের সিন্টু, দীপঙ্কর প্রমুখদের কথা মনে করতে চাই। এদের সকলের সাথে এবং পরবর্তীকালে যোগদানকারী বেশ কিছু অধ্যাপকদের সাথে আমার সম্পর্ক মধুর ও আন্তরিক। কলেজের শিক্ষাকর্মীদের সাথে আমার সম্পর্ক ছিল বেশ হার্দিক। বড়বাবু সবুজবাবুর মৃত্যু আমাদের খুব আঘাত দিয়েছিল। পুরোনো শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে নীলরতনবাবু, শঙ্করবাবু, সুনীলবাবু সবার সাথেই আমার মধুর সম্পর্ক ছিল। তাঁদের নানা সমস্যার কথা ও চাকরি সংক্রান্ত বিষয় অনেকসময় পরিচালন সমিতিতে তুলে ধরেছি। অনেকগুলি মৃত্যুও আমাকে বেশ কষ্ট দিয়েছে। অধ্যাপক পরিমল হাজরার মৃত্যুর ঘটনা খুব পীড়া দিয়েছিল। পরবর্তীকালে সোমনাথ, নাজির, মিঠুন, মহাদেব ঘোষ এবং সম্প্রতি শৈলেন-এর অকালমৃত্যু আমাকে বেশ কষ্ট দিয়েছে। কারণ এঁদের সকলের সাথেই আমার সম্পর্ক ছিল অকৃত্রিম হার্দিক। এখন যাঁরা শিক্ষাকর্মী আছেন তাঁদের মধ্যে উদয়বাবু, শ্রীকান্তবাবু, সুশান্তবাবু, বিবেকানন্দ, নিরঞ্জন, বিশ্বজিৎ লামা প্রভৃতি অনেকের সাথেই আমার আন্তরিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে।

সুদীর্ঘ প্রায় সাড়ে চব্বিশ বছর এই মহাবিদ্যালয়ে সক্রিয়ভাবে কাটানোর পর পার্শ্ববর্তী অন্য একটি মহাবিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিয়েছি অধ্যক্ষ হিসাবে। সেখানেও প্রায় আট বছরের চাকরি হল। বৃহত্তর দায়িত্ব পালনে যতই ব্যস্ত থাকি, এখনও নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের দীর্ঘ সক্রিয় সান্নিধ্য এই মহাবিদ্যালয় সম্পর্কে আমাকে দুর্বল করে রেখেছে। আমন্ত্রণ থাকুক বা না থাকুক এখনও ছুটে যাই এই প্রাক্তন কর্মস্থলে, নস্টালজিক হয়ে

পড়ি সেখানে গিয়ে, যে কোন অনুষ্ঠানকেই যেন এক বিশেষ ভালোলাগা ও ভালবাসার চোখে দেখি। সবশেষে আমার ঐকান্তিক আবেদন মহাবিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে - এই মহাবিদ্যালয়টি সবক্ষেত্রে যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, তাকে আগামীতে আপনারা সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করবেন, একে আরো বেশি উচ্চতায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করবেন। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নেতাজী মহাবিদ্যালয় একটি অনুকরণীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে উচ্চশিক্ষার অঙ্গণে পরিচিত হোক - এই আশা-আকাঙ্ক্ষা রেখে লেখাটির এখানেই ইতি টানছি।

# স্মৃতির মণিকোঠায় - নেতাজী মহাবিদ্যালয়

ড. তারকনাথ রায়

যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের অমূল্য সম্পদ। প্রাচীনকালের যা গুরুগৃহ বা টোল, পাঠশালা তাই আজকের দিনে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। ভারতবর্ষে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় কলকাতায়। ১৮৫৭ সালে দ্বারভাঙার মহারাজা মহেশ্বর সিংহ বাহাদুর এই জন্য জমি দান করেছিলেন। তৎকালীন বাংলাদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের জন্য আমরা রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে ঋণী। রাজা রামমোহন রায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ারের সহযোগিতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়। বিদ্যাসাগর নিজে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকা অবস্থায় অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এছাড়া ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে জমিদার শ্রেণীর আনুকূল্যে কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আরামবাগ বা তৎসন্নিহিত এলাকায় স্বাধীনতা পর্যন্ত কলেজ বা মহাবিদ্যালয় কোথাও ছিল না। রাঢ়বঙ্গের এই বিস্তীর্ণ এলাকায় ছিল পূর্বদিকে শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজ, পশ্চিমদিকে বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজ, উত্তরদিকে বর্ধমান রাজ কলেজ এবং দক্ষিণদিকে মেদিনীপুর কলেজ। সবকটি কলেজই আরামবাগ বা তৎসন্নিহিত এলাকা থেকে বহুদূরে। বাংলায় নবজাগরণের তিনজন মণীষী রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণের জন্ম এই এলাকায়। অথচ এই অঞ্চলে শিক্ষার পরিকাঠামো শুধুমাত্র পাঠশালা, টোল এবং গুটি কয়েক বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চশিক্ষার কোনা সুযোগ ছিল না। উচ্চশিক্ষা তখন ছিল কলকাতা কেন্দ্রিক। কারণ একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে যে শিক্ষাগত যোগ্যতা মানের অধ্যাপক প্রয়োজন তা গ্রামাঞ্চলে পাওয়া তখন অসম্ভব ছিল। আরও নানা প্রতিবন্ধকতা ছিল। সমস্যা ছিল জমি ও অর্থের। কিন্তু সেইসব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে এই এলাকার সমাজকর্মী ডাঃ রাধাকৃষ্ণ পাল তাঁর পথপ্রদর্শক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর নামে এই কলেজ ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। নামকরণ হয় 'নেতাজী মহাবিদ্যালয়'। জমি দান করেন কালিপুরের আদি বাসিন্দা আঢ্য, কুণ্ডু, বল্লভ, নন্দী প্রভৃতি পরিবার। শোনা যায়, আরামবাগের আরও অনেক গুণী ব্যক্তি এই কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে ডাঃ পাল যে এ বিষয়ে মুখ্য ও অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই তাঁকেই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মনে করা হয়। কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল সেটি নিয়ে আমাদের কৌতূহল থাকবে। কিন্তু তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল কীভাবে শুরু হয় তার পথ চলা।

আজকের কালিপুর কলেজের সামনে দাঁড়ালে পুরানো কালিপুর কলেজকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। সময়ের সঙ্গে সব বদলে গেছে। খুব পুরোনো দিনের কথা বাদ দিলেও আশির দশকের শেষ ও নব্বই এর

* প্রাক্তন অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ

দশকের প্রথমের কথা। প্লাস্টার না হওয়া ইটের দেওয়ালের উপর খড়ের চাল। একটি ব্ল্যাকবোর্ড নির্বাক হয়ে পেরেক থেকে দুলছে। সেটাই ক্লাসরুম। আবার সেই একই রকম দেওয়াল উপরে শুধু টিনের ছাউনি। সেটাই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার ল্যাবরেটরি। সদ্যপ্রয়াত অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ বসে আছেন প্রায় অন্ধকার ঘুপচি মতন ঘরে। পাশের দুটো ছোটো ছোটো ঘরে চলে কলেজের অফিস, কর্মীদের ভালো করে বসারও জায়গা নেই। একই টেবিলে দুই পাশে বসে কাজ করছেন ক্যাশিয়ার অনিলবাবু ও হিসাব রক্ষক নীলরতনবাবু। দেওয়াল থেকে বের করে আনা টিনের চালায় ছাত্র সংসদের অফিস, সেখানেই সারাদিন গল্পগুজব আর আন্দোলনের ছক। কলেজে দেখার মতো ছিল শুধু দোতলা একটা বিল্ডিং। দোতলায় ঠাঁই পেয়েছে প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা এবং ভূগোল। একতলায় কয়েকটা ছোটো ছোটো ঘর আর বিশাল একটি হলঘর - ৬ নং রুম। সেখানে কমার্সের আর বাংলার ক্লাস হয়। এতবেশি ছেলেমেয়ে যে সবাই বসতেও জায়গা পায় না, দাঁড়িয়েই ক্লাস করতে হয়। তবু ছেলেদের মনে কোনো দুঃখ নেই। সামনের আমগাছের বাঁধানো বেদিতে তারা বসে থাকে সারাদিন। নতুন পাতানো বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে, Notes দেওয়া-নেওয়া করে। আর তাকিয়ে থাকে ওই দোতলা বিল্ডিং-এর দিকে, কখন তার ক্লাসের সময় আসে। দোতলা বিল্ডিং সর্বদা প্রাণবন্ত। বিভিন্ন ঘর থেকে ভেসে আসে ছেলেমেয়েদের গুঞ্জন আর অধ্যাপকদের জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর। ৪ নং ঘরে অংকের ক্লাস। বোর্ডভরা অংক কষা। নবকুমারবাবু, পীযূষবাবু, তিনকড়িবাবু, রথিনবাবু সবাই অংকের জাহাজ। দূর দূরান্ত থেকে ছেলেরা আসে গণিত বিভাগে পড়তে। আদিত্যবাবু মোটা একটা বই নিয়ে চলেছেন ৬ নং ঘরের দিকে। Accountancy পড়াবেন বলে। তাঁরই ছাত্র মনিবাবু, কলেজেরই অধ্যাপক। গর্ব করে বলতেন - ওঁনার মতো পণ্ডিত গঙ্গার এপারে নেই। ৫ নং ঘরে শক্তিবাবু একটানা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়িয়ে চলেছেন। অবেলাতেও তাঁর ঘর ছাত্রছাত্রী ভর্তি। একটু দূরেই দাঁড়িয়ে শুনলেই বোঝা যায় তাঁর দরদ এবং আন্তরিকতা। কলেজে প্রায় ৭০ জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা। সকলেরই পাণ্ডিত্য, ছাত্রদরদী মনোভাব আর কলেজের প্রতি ভালোবাসা প্রায় এক। কাকে বাদ দিয়ে কার কথা আলোচনা হবে। সকলের কথাই স্মৃতিকণায় উঁকি দেয়। আজ সবই ইতিহাস।

১৯৪৮ সালে কালিপুর ছিল দ্বারকেশ্বর নদের তীরে এক বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কৃষিজ পণ্য কেনাবেচার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল কালিপুর। নৌপথে যাতায়াতের সুবিধার জন্য নদীর তীরে গড়ে উঠত এরকম অনেক গঞ্জ। গোঘাট, কোতুলপুর, রামজীবনপুর, হাজীপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে চাষীরা ধান বিক্রি করার জন্য কালিপুরে আসতেন। এখান থেকে ধান-চাল বোঝাই হয়ে নৌকা চলে যেত আরও বড় গঞ্জের উদ্দেশ্যে। কেনা-বেচা হত বলে কালিপুরে গড়ে উঠেছিল একটি জমজমাটপূর্ণ বাজার। তখনো দ্বারকেশ্বরে রামকৃষ্ণ সেতু হয়নি। বিষ্ণুপুর থেকে বাস এসে কলেজের পাশেই দাঁড়াত। এটিই আরামবাগ আসার শেষ স্টপেজ। শোনা যায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এই পথেই কলেজের পাশ দিয়ে দ্বারকেশ্বর নদ পেরিয়ে হাঁটা পথে কলকাতা যেতেন। সেই

স্মৃতিতে স্থানীয়রা কলেজের পাশে একটি মন্দিরও নির্মাণ করেছেন। মোটরগাড়ি চলাচল শুরু হয়েছে অনেক পরে। পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে বা ষাটের দশকের প্রথমের দিকে। অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক দীপকবাবু, ইংরাজী বিভাগের অধ্যাপক সত্যবাবু কলকাতা থেকে এসে এই কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। তাঁদের কথায় তাঁরা এই কলেজে প্রথম গরুর গাড়িতে করে এসেছিলেন। বিষ্ণুপুর স্টেশনে নেমে জয়পুর জঙ্গল পেরিয়ে সারারাত গরুর গাড়িতে এসে কালিপুরে পৌঁছেছিলেন। এসে কী দেখেছিলেন? দেখেছিলেন - দুটো খড়ের চালের মাটির ঘর। সেটাই কলেজ।

এখন হয়তো মনে হবে এসব গল্প। কিন্তু ১৯৪৮ সালে এটাই ছিল নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের রূপ। একেবারেই ছোট্ট একটি চারাগাছ। মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু চারিদিকে নানা প্রতিকূলতা। সদ্য স্বাধীন একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমন নয় যে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ হবে। প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যেরই ভালো পরিকাঠামো নেই। দেশটি ব্রিটিশের শাসনে ও শোষণে জর্জরিত। কৃষি, শিল্প, পরিকাঠামো কিছুই গড়ে ওঠেনি। প্রকৃতি নির্ভর কৃষিব্যবস্থায় প্রায়ই নেমে আসে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। দেশের লোকের যেখানে অন্নেরই সংস্থান নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, শিশু মৃত্যুর হার বেশি, মানুষের গড় আয়ু কম, নিরক্ষরতার হার বেশি, সেই অবস্থায় উচ্চশিক্ষায় যে সরকারি আনুকূল্য বা ব্যয়বরাদ্দ বেশি হবে না - সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু হতাশার এই সার্বিক পরিস্থিতিতে ডাঃ পালের প্রচেষ্টায় নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়েছিল। যে চারাগাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল তা আজ মহীরূহে পরিণত হয়েছে।

তবে সেই চারাগাছ মহীরূহ হওয়ার পিছনে অনেক মানুষের অবদান আছে। আছে অনেক দ্বন্দ্ব, সহযোগিতা, তর্ক-বিতর্ক, মান-অভিমান ও সুখ-দুঃখের স্মৃতি। এসবই হল যে কোন প্রতিষ্ঠানের পথ চলার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। একে অস্বীকার করার উপায় নেই। পরিবারের প্রধানের উপর যেমন সবাই নির্ভর করে এবং তার উপর সব মান-অভিমান করে, ঠিক তেমনই কলেজের অধ্যক্ষের উপর সবাই নির্ভর করে ও সব মান-অভিমান প্রকাশ করে। অধ্যক্ষকে সব সহ্য করতে হয়, কিছু মেনে নিতে হয়, আবার কিছু মানাতেও হয়। কিন্তু কঠিন হস্তে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে কলেজকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে হয়। আমি আমার দীর্ঘ অধ্যাপক জীবনে দুজন অধ্যক্ষের অধীনে অধ্যাপনা করার সুযোগ পেয়েছি। একজন স্বর্গতঃ বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ ও অপরজন বর্তমানে অধ্যক্ষপদে আসীন মাননীয় ড. অসীম কুমার দে। এঁদের দুজনেরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টা নেতাজী মহাবিদ্যালয়কে উন্নতির পথে নিয়ে গেছে। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীদের অবদান তো আছেই।

গোঘাটের শুনে-আমোদপুর গ্রামের বাসিন্দা শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোষ ছিলেন সমাজহিতৈষী এবং জননেতা। তিনি এই কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। সকল শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রদের অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিলেন। প্রায় দেড়বছর অংশকালীন অধ্যাপক হিসাবে তাঁর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ পাই। কিন্তু

দুর্ভাগ্যের বিষয় পরে আমি যখন কাটোয়ায় L.I.C তে কর্মরত তখন হঠাৎ তিনি ইহলোক ছেড়ে চলে যান। মাননীয় স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ তখন কলেজের অধ্যক্ষ। উনিও আজ আমাদের মধ্যে নেই।

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ এই কলেজেরই প্রাক্তন ছাত্র এবং ইতিহাস বিভাগে নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় এই কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। যে কলেজের ছাত্র ছিলেন, সেই কলেজেরই অধ্যক্ষ হয়ে কলেজের উন্নতির জন্য তিনি অদম্য উৎসাহে কাজ শুরু করলেন। অধিকাংশ অধ্যাপকই তাঁর একসময়ের শিক্ষক। তাঁরা ছাত্রের পাশে দাঁড়ালেন। ইংরাজীর সত্যবাবু, অর্থনীতির দীপকবাবু, অংকের পীযূষবাবু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দুলালবাবু প্রমুখ সবাইকে নিয়ে বিজয়বাবু অধ্যক্ষরূপে কলেজ পরিচালনার চেষ্টা করলেন। আমি তখন কলেজ সার্ভিস কমিশনে অধ্যাপনার জন্য মনোনীত হয়েছি। বিজয়বাবুর এবং সমস্ত অধ্যাপকদের আন্তরিক আগ্রহে আমি এই কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করলাম।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগটি এখন কাঁচ দিয়ে ঘেরা আছে। কিন্তু ওই ঘেরাটোপের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কতো ইতিহাস। দক্ষিণমুখী ঐ বিল্ডিংটি তখন একতলা ছিল। ওখানেই ছিল স্টাফরুম, লাইব্রেরি পাশাপাশি। আর বারান্দার এক কোণে উপেনবাবুর চায়ের ক্যান্টিন। লম্বা একটা ঘরে, লম্বা একটা টেবিলের চারপাশে সারিসারি চেয়ার, দেয়ালের ধারে কয়েকটা আবলুস কাঠের সোফা। শোনা যায় নাকি সেগুলি বর্ধমান রাজবাড়ি থেকে দেওয়া হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব কোণে একটা ক্যারম বোর্ড আর উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি মাটির জালা - অধ্যাপকদের জল খাওয়ার বন্দোবস্ত। বাথরুম বহু দূরে। লম্বা বারান্দা পেরিয়ে যেতে হয়। এই ছিল স্টাফরুম। সর্বদাই প্রাণবন্ত। বসে আছেন দর্শন বিভাগের অনিন্দিতাদি, রীতা দুবে। রসায়ন বিভাগের যশোধরাদি ও প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অনিতাদি। তার পাশে অর্থনীতির দীপকবাবু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শক্তিবাবু ও দুলালবাবু, ইংরাজি বিভাগের সত্যবাবু ও রবীনবাবু এঁরা সবাই অধ্যাপনা জীবনের মধ্যগগণে। সকলেই খ্যাতনামা ও ছাত্রদের কাছে প্রিয়। গণিত বিভাগের পীযূষবাবু ও রথীনবাবু। প্রবীণ ও নবীন মিলিয়ে প্রায় ৭০ জন অধ্যাপক। বিভিন্ন বিষয়ের উপর গভীর আলোচনা থেকে সরস কৌতুক, টীকাটিপ্পনি, কর্তৃপক্ষের ন্যায়-অন্যায়ের সমালোচনা সবই হত ঐ চার দেওয়ালের মধ্যে। একপাশে চলত আনন্দের ক্যারম খেলা। মুরারীবাবু যাকে সবাই ভালোবেসে মেজদা বলে ডাকত - তিনিই সবাইকে মাতিয়ে রাখতেন ক্যারম খেলায়। চারজন খেলত - দাঁড়িয়ে থাকত দশ-বারোজন। এখনো সবার কথা মনে পড়ে। বাণিজ্য বিভাগের দেবকুমার সামন্ত, অর্থনীতি বিভাগের গোলাম মইনুদ্দিন মিধ্যা ও নবকুমার ঘোষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কার্ত্তিকচন্দ্র মণ্ডল ও প্রণব কুমার দালাল। অধ্যাপনার পাশাপাশি এঁরা প্রায় সবাই কলেজ পরিচালন সমিতির সদস্য হিসাবে কলেজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে গেছেন। বিজয়বাবু অধ্যক্ষ থাকাকালীন কলেজে দুটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন কেন্দ্র (Study Centre)-র সূচনা হয়। কলেজে যখন নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পঠন-পাঠন চালু হয়, প্রণববাবু সেই কেন্দ্রের

দায়িত্ব এবং কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। কিছুদিন পরে ইন্দিরা গান্ধি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন কেন্দ্রের সূচনা হয় এবং প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক তরুণ ঘটক সেই কেন্দ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

অধ্যক্ষ বিজয়বাবু ঠিক ১১টায় সময় স্টাফরুমে চলে আসতেন। ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেন। স্টাফরুমে এসেই কলেজ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে বা আর্থ সামাজিক বিষয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা শুরু করতেন। একই সঙ্গে মনে হয় একটুকু নজরদারিও করে নিতেন। তখন অধ্যাপকদের কলেজে হাজিরার ব্যাপারে পাঁচদিন পাঁচ ঘন্টার নিয়ম চালু ছিল না। যার যখন ক্লাস থাকত, তিনি তখন এসে সেই ক্লাস নিতেন। বিজয়বাবু প্রথম পাঁচদিন পাঁচ ঘন্টা নিয়ম চালু করেছিলেন। এ নিয়ে অশান্তি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অধ্যাপকরা সবাই মেনে নিয়েছিলেন। তবে অশান্তি যখন শুরু হয়, তখন তা সহজে শেষ হয় না। বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপকদের সঙ্গে, শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে ও ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর প্রশাসনিক বিরোধ হয়েছে। মনে আছে একদিন কলেজে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অধ্যাপকদের সঙ্গে উনি ঘেরাও হয়ে গেলেন। উনি খেয়ে আসতেন না। দুপুরে গিয়ে পাশেই ওনার কোয়ার্টারে খেয়ে আসতেন। সেদিন ওনার সারাদিন খাওয়াই হল না। আমার ব্যাগে কি একটা ফল ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে ওনাকে দিলাম। উনি সেই ফলটুকু খেয়ে রাত্রি পর্যন্ত ঘেরাও হয়ে রইলেন। তারপর সত্যবাবু প্রমুখ প্রবীণ অধ্যাপকদের চেষ্টায় ঘেরাও মুক্ত হলেন। বিজয়বাবু থাকতেন নিজের সিদ্ধান্তে অনড়। সেজন্য বিরোধ সহজে মিটত না। তবে কলেজেরই কিছু প্রবীণ ও নবীন অধ্যাপক ও কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি মাননীয় শ্রী বিনয় দত্ত মহাশয় মধ্যস্থতা করে অনেক বিরোধ মিটিয়ে দিতেন। কলেজে যোগদানের পর থেকে আমরা এসবের সাক্ষী। আমাদেরও সেই অশান্তির কষ্ট কমবেশি ভোগ করতে হয়েছে।

তাঁরা অনেকেই আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আজ স্বীকার করতেই হবে যে বিজয়বাবুর কলেজ পরিচালনার সূত্রে কলেজের নিয়মশৃঙ্খলার সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। একথা ঠিক প্রত্যেক কলেজেই নিজস্ব নিয়ম শৃঙ্খলা সবসময়ই থাকে। আগেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু সময়ের সাথে ও পারিপার্শ্বিক কারণে কোন কোন সময় শিথিলতা গ্রাস করে। বিজয়বাবুর দৃঢ় মনোভাব সেই শিথিলতা হ্রাস করে কলেজের দীর্ঘকালীন উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছিল। আমরা শিক্ষক স্বার্থে হয়তো কিছু ক্ষেত্রে তাঁর বিরোধিতা করেছি - কিন্তু কলেজের সার্বিক উন্নতিতে তাঁর পাশে সবসময় থেকেছি। তাই মতান্তর হয়তো হয়েছে, কিন্তু মনান্তর হয়নি।

১৯৯১ সালে জানুয়ারি মাসে পরমার্থ ঘোষ ভূগোল বিভাগে আর আমি ডিসেম্বর মাসে অর্থনীতি বিভাগে যোগদান করলাম। কিন্তু তখন থেকেই অবসর নেওয়ার পালা শুরু হল। প্রথমে চলে গেলেন অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ কর তারপর ব্রজেশবাবু - দুজনেই ইতিহাস বিভাগের প্রবীন অধ্যাপক। কত দীর্ঘ সময়- বোধহয় কলেজের প্রথম থেকেই এঁরা কলেজে ছিলেন। তার কিছুদিনের মধ্যে দর্শন বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক সীতাংশু

দত্ত অবসর নিলেন। নিজের বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ১৯৯৫-২০০০ সালের মধ্যে অনেক প্রবীণ অধ্যাপক অবসর নিয়ে চলে গেলেন। মনে পড়ে দীপকবাবুর কথা। কলকাতা থেকে ঠিক সময়ে কলেজে পৌঁছাতেন। এসেই উপেনবাবুর কাছে এক কাপ চা খেয়েই বিমলদার কাছ থেকে ছাত্রদের Attendence -এর খাতাটি নিয়ে পা বাড়াতেন ক্লাসের দিকে। কয়েক বৎসর আগে অর্থনীতিতে অনার্স চালু হয়েছে। অনার্সে অনেক জটিল তত্ত্ব পড়াতে হয়। ক্লাস থেকে এসেই কোনো একটি জটিল সমস্যা উত্থাপন করতেন। উনি আমাকে সেই তত্ত্বের আরও গভীরে নিয়ে যেতেন।

একটি সরকারী অনুদান প্রাপ্ত কলেজে সারাবছর কতো ঘটনাই ঘটে। যেমন - ছাত্র ভর্তি, ছাত্র সংসদ নির্বাচন, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা - এগুলি সবই ছাত্র সংক্রান্ত। কোথাও একটুখানি ত্রুটি ঘটলে তার দায় কলেজ এবং কলেজ অধ্যক্ষের কাঁধে এসে পড়ে। অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে দুটি নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক সমিতির সম্পাদক ও কলেজ পরিচালন সমিতির শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন। প্রতি বছর এই দুটি নির্বাচনকে ঘিরে চাপা উত্তেজনা থাকত। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও উপগোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে উঠত। এই চাপা উত্তেজনা মাঝে মাঝে স্টাফরুমে শিক্ষক সমিতির সভায় বিস্ফোরিত হত। সবাই বিভিন্ন মতামত দিত। একজন কিন্তু চুপ করে বসে থাকতেন। তিনি শক্তিপদ মান্না। সবকিছু শুনতেন। আসলে কলেজের ভিতর বিভিন্ন সমীকরণ ছিল শক্তিদার নখদর্পণে। তাই শেষপর্যন্ত মিটিং-এর বাইরে থেকে একটা সমাধান সূত্র তার কাছ থেকেই আসত। কালো, মোটাসোটা শক্তিদা কলেজের সব বিষয়ে জড়িয়ে থাকতেন। কেবল কলেজ সংক্রান্ত সমস্যাই নয়, সহকর্মীদের সঙ্গে একটা আত্মিক সম্পর্ক ছিল তাঁর। অনেকেই তাঁদের ব্যক্তিগত বা কলেজ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য শক্তিদার উপর নির্ভর করতেন। আমার খুব সৌভাগ্য যে আমি শক্তিদার মতো একজন মানুষকে আমার দাদা হিসাবে পেয়েছিলাম। যাক এরকমভাবে নয়ের দশক কেটে গেল। একবিংশ শতক শুরু হল। বিজয়বাবু ২০০৩ সালে অবসর নিলেন। বিজয়বাবু যাবার সময় থেকেই পরিকাঠামো বদল শুরু হয়েছিল। পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন বিদ্যার গবেষণাগারের জন্য একটি নতুন ভবন নির্মিত হল। ছাত্রীদের জন্য একটি নতুন হোস্টেল নির্মিত হল। মাননীয় বিধায়ক বিনয় দত্ত মহাশয় এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। অধ্যক্ষের ঘর ও অফিস শিক্ষকদের স্টাফরুমের পাশে স্থানান্তরিত হল। চাঁপাডাঙা কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ড. অসীম কুমার দে সেই নতুন ঘরে এসে অধ্যক্ষের দায়িত্বভার নিলেন।

অসীমবাবু আসার পর কলেজে একটি নতুন যুগের শুরু হল। ইতিমধ্যে অনেকেই যেমন অবসর নিয়েছেন, তেমনি অনেক তরুণ অধ্যাপক কলেজে এসে যোগ দিয়েছেন। অর্থনীতি বিভাগের গোলাম মইনুদ্দিন মিধ্যা ও বাণিজ্য বিভাগের সমীর সিনহা অন্য কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে চলে গেছেন। এককথায় কলেজের শিক্ষকদের কাঠামোয় একটা পরিবর্তন হয়েছে। প্রবীণদের পরিবর্তে নবীনদের সংখ্যা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। অসীমবাবু

দায়িত্ব গ্রহণ করার পর নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করলেন। সেই সময় পর্যন্ত কলেজের উল্লেখযোগ্য কোন ভবন তৈরি বা কাঠামোগত কোন পরিবর্তন হয়নি। ইতিমধ্যে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি ও নতুন বিষয় চালু হওয়ার জন্য ক্লাসরুম, প্রত্যেক বিভাগের জন্য আলাদা কক্ষ ইত্যাদির প্রয়োজন বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু এরজন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ আর্থিক সঙ্গতি। সেই সময় সেই পরিমাণ আর্থিক সঙ্গতি কলেজের ছিল না। আমার যতদূর মনে পড়ে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক স্বর্গত নিখিলচন্দ্র রায় খড়ের ক্লাসরুমগুলি ভেঙে দিয়ে সেখানে ছোট করে একটি ভবন নির্মাণের পরামর্শ দেন অধ্যক্ষকে এবং তিনিই বিল্ডিং কমিটির প্রধান হিসাবে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেন। পরিচালন সমিতির তৎকালীন সভাপতি স্বর্গত বিনয় দত্ত মহাশয়ের MLA LAD এর টাকা এবং কলেজের ফাণ্ড থেকে কিছু অর্থ দিয়ে পুরানো ভাঙাচোরা শ্রেণীকক্ষের পরিবর্তে নতুন একটি ভবন নির্মাণ শুরু হয়।

অসীমবাবু অধ্যক্ষের দায়িত্ব নেবার পর কলেজের প্রশাসনিক পরিকাঠামোর পুনর্বিন্যাস হয়। নতুন করে বিভিন্ন সাব কমিটি তৈরি হয় এবং বিভিন্ন অধ্যাপক সেইসব কমিটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যেমন Academic Sub-Committee তে অধ্যাপক পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী, Examination Sub-Committee তে শক্তিপদ মান্না, বিল্ডিং কমিটিতে নিখিল রায় এবং এরকম আরও কমিটি অসীমবাবুর পরিচালনায় খুব সার্থকভাবে কাজ করে। অধ্যাপক পরমার্থ ঘোষ কলেজের প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। অসীমবাবুর সঙ্গে তিনি পূর্ণ উদ্যমে কলেজ উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হলেন। তখন কলেজে NAAC এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে (২০০৬-২০০৭)। অধ্যাপক পরমার্থ ঘোষ NAAC কমিটির Co-Ordinator এর গুরু দায়িত্ব নিলেন। ইংরাজির অধ্যাপক উদয় নন্দী এই কমিটির নানা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে পালন করেছিলেন। আমিও বাদ গেলাম না। মূলতঃ পরমার্থদার পরামর্শে অধ্যক্ষ আমার উপর Bursar এর দায়িত্ব দিলেন। অসীমবাবুর প্রত্যক্ষ সাহচর্যে Bursar এর দায়িত্ব পালনে অসুবিধা হয়নি। দীর্ঘ প্রায় দশ বৎসর কলেজে Bursar পদে থাকার সুযোগ পেয়েছি। এই সময়ে অনেক কিছু শিখেছি। ক্লাসের ফাঁকে যেটুকু সময় পেতাম তা অফিসে আর Principal রুমে কাটিয়ে দিতাম। কাজ করার অদম্য আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। Bursar এর ঘরে Computer নিয়ে কাজ করতাম।

অস্বীকার করব না - শক্তিদার পর অসীমবাবুও এরকমই ভালোবেসেছিলেন। Bursar-এর ছোট্ট খুপরিতে Computer-এ UGC-র কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম। অসীমবাবু আমাকে ডাকতে পাঠাতেন। কাউকে বলতেন - তারককে ডেকে নিয়ে এসো। এসব হয়তো ছোট ছোট ঘটনা। কিন্তু মনে দাগ রেখে যায়। সেই ছোট্ট Maruti 800 চেপে অসীমবাবুর সঙ্গে কালিপুরে আসতাম। জগবন্ধুর দোকানে চা-সিঙাড়া আর রাধার দোকানে পান খেয়ে সন্ধ্যের পর আমি কোতুলপুরের বাস ধরতাম। অসীমবাবু কলেজে আসার পর যে কর্মকাণ্ড শুরু

হয়েছিল - সেই কর্মকাণ্ডে এরকমই ছিল রোজ নামচা। সারাদিন এভাবেই আমাদের ব্যস্ততায় দিন কাটত। হত মিটিং, আলোচনা, হিসাব-নিকাশ, রিপোর্টিং, লেখা, পরিকল্পনা ইত্যাদি। এভাবেই হয়েছে একের পর এক বিল্ডিং, প্রশাসনিক ভবন, নতুন লাইব্রেরি, সব পুরোনো বিল্ডিং-এর দোতলা, তিনতলা, নতুন হোস্টেল - আরও কত কিছু। আস্তে আস্তে মহাবিদ্যালয়ের রূপটাই বদলে গেছে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থমূল্য হ্রাস পায়। এককালে কোটি টাকার নাম শুনলে চোখ কপালে উঠত - কিন্তু এখন যেন অনেকটা গা-সওয়া হয়ে গেছে। তখন কেন্দ্রীয় সরকার UGC-র মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ধরে কলেজগুলিকে উন্নয়নের জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য দিত। কিন্তু সেই টাকা পাওয়ার নিয়মকানুন ও শর্তাবলী ছিল কঠিন। UGC-র নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট ব্যয়ের পরিকল্পনা করে পাঠাতে হত। অধ্যক্ষের উৎসাহে এবং পরামর্শে আমরা এক কোটি টাকার দাবি জানিয়েছিলাম। আমাদের তখন একটি গ্রন্থাগার ভবনের প্রয়োজন ছিল। কলেজে কী আছে, কী নেই, আগামীদিনে কী প্রয়োজন হতে পারে সব কিছু ভেবে UGC র কাছে Project পাঠানো হয়েছিল। হেডক্লার্ক পরেশবাবু, অ্যাকাউন্টেন্ট উদয়বাবু, UGC র দায়িত্বপ্রাপ্ত রফিকুল, শ্রীকান্ত, বিবেকদা - অফিসের সবাই এরজন্য চিন্তাভাবনা এবং পরিশ্রম করেছেন। মনে আছে আয়লা ঝড়ের পরদিন কলকাতায় Interface Meeting ছিল। ঝড়ের তাণ্ডবে সবকিছু তছনছ হয়েছে। গোটা রাস্তায় গাছ পড়ে আছে। আমি, উদয়বাবু ও অধ্যাপক মনিবাবু কোনরকমে কলকাতায় UGC র Office এ হাজির হয়েছিলাম। Interface Meeting এর অফিসার সবকিছু খুঁটিয়ে দেখলেন এবং আমাদের সৌভাগ্য যে ৯৫ লক্ষ টাকার অনুমোদন দিলেন। বাংলা বিভাগে স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা তখনও পাঁচবছর পূর্ণ হয়নি বলে ৫ লক্ষ টাকার অনুমোদন দেননি। এখনো সেই দিনের কথা আমার মনে জাগে।

আজ সব ইতিহাস এবং স্মৃতির পাতায় চলে গেছে। স্মৃতির পাতা হাতড়ালে আরও অনেককিছু মনের মধ্যে ভিড় করে আসে। হয়তো কালের নিয়মে অনেক কিছুই আমাদের মন থেকে হারিয়ে যাবে। সেটাই স্বাভাবিক। কিছু কথা বললাম এই কারণে যে, একটি চারাগাছ যেমন বড় করে তোলা কঠিন - একটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তাই। একজন অধ্যক্ষ তার সহকর্মীদের নিয়ে সেই চিরন্তন উদ্যোগ এবং চেষ্টা করেন বলেই চারাগাছ মহীরূহে পরিণত হয়।

আমার দেখা দুজন অধ্যক্ষ - বিজয়বাবু ও অসীমবাবুর ক্ষেত্রে তা যেমন সত্য, তেমনই আমার দেখা আমার সমস্ত প্রবীণ ও নবীন, সমবয়সী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সহকর্মীদের ক্ষেত্রেও তা তেমনই সত্য। সকলে যদি না চাইতেন তবে নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের এই আমূল পরিবর্তন আমরা দেখতে পেতাম না। এখনো মনে পড়ে উপেনবাবুর সেই তেলচিট্চিটে ক্যান্টিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা নিতাইদা, রাধাকেষ্টদা, বিমলদা। সবাই একসঙ্গে বসে চা আর টোস্ট খেতে খেতে গল্প করা।

এখনো মাঝে মাঝে যাই। সেই আমগাছ এখনো আছে। তারই তলায় দাঁড়িয়ে চুপ করে খুঁজি সেই পুরোনো দিনগুলিকে। মনে মনে ভাবি আর কি কোথাও ফিরে পাব সে জীবন। এ কলেজ ছেড়ে কোথাও যাব ভাবিনি। কিন্তু পুরোনো সহকর্মী ও পুরোনো দিনগুলি যখন আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে লাগল - তখন আর মন টিকল না। ২০১৫ সালে কলেজ ছেড়ে অন্য কলেজে চলে এসেছি। সেখানে মানিয়েও নিয়েছি। তবু স্মৃতির মণিকোঠায় সবসময় ভেসে আসে - নেতাজী মহাবিদ্যালয়ের সেইসব ফেলে আসা দিন। অসীমবাবু এখনো ভালোবাসেন দাদার মতো। আগামীদিনে আরও পাল্টে যাবে নেতাজী মহাবিদ্যালয়। তখন আর কেউ চিনবে না। তাতে দুঃখ নেই। কারণ যখন ছেড়ে এসেছিলাম তখন মনে মনে বলেছিলাম - যাবার সময় এই কথাটি বলে যাই, যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।